কোনো এক রাতে

বেদুইন

চিত্রালোক
কলকাতা ১২। ৮/১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

আমার সহধর্মিণী উমারাণীকে

প্রেম যার পুরস্কৃত হয়েছে লাঞ্ছনায়, প্রীতি পেয়েছে অবমাননা, স্নেহ পেয়েছে দুঃখের প্রলেপ, তাকেই দিলাম।

॥ এক ॥

ঘুমিও না !

জেগে থাক ! আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনী জাগরণের মত জাগতে হবে না, শুধু একটি মাত্র রজনী জেগে থাক। নয়ন-পল্লব ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও সজাগ হয়ে থেক, সতর্ক প্রহরীর মত নীরবে শুনে চল। কত কথাই অকথিত রয়ে গেছে ; আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব শেষ হতে না হতেই আশাহত এই জীবনের হয়ত শেষ এসে গেছে। যবনিকার কালো পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসবে জীবননাট্যের রঙ্গভূমিতে ; ক্লান্তিতে তুমি এলিয়ে পড়েছ রণবিধ্বস্ত সৈনিকের মত। এ ঘুম যদি না ভাঙে, বুকের মাঝে জমাট বাঁধা এ কাহিনী কে শুনবে ! প্রশান্ত প্রভাতের আলোকে যার জন্ম, তার মৃত্যু অমানিশায় ; সমস্যা জর্জরিত জীবনের এই বুঝি পরিণতি। তবুও রূপকাহিনী নয়, চারণের বীরত্বগাথা নয়, অতি সাধারণ এসব কাহিনী। তোমার-আমার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এদের প্রভাব। অকথিত এই কাহিনীর মালা গলায় দিয়ে চির বিশ্রামের গেহে চলে যেও, আপশোষ আর রইবে না।

পাথেয় যা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। দিয়ে এসেছি পাবার আশায়, পেয়েছি শুধু শূণ্য, শূণ্যতার মাঝ দিয়ে গড়ে উঠেছে জীবনের সৌধ, বুনিয়াদ তার কাঁচা হর্ম-খিলান অপোক্ত, সুন্দরতা তার শ্যাওলা ধরা, পিছলে যায় পদক্ষেপ। তবুও থমকে যেওনা। গতিহীনতা শূণ্যতার অভিশাপ।

*কতজনের কত পদক্ষেপ মর্মরিত হয়েছে জীবনের এই দর-*দালানে, শিহরিত হয়েছে হৃদি-ধর্ম। হিসাব আজও হয়নি, তবুও একদিন নিরালায় বসে মনের শ্লেটে চিন্তার কঠিনীপাত করে হিসাব করতে চেয়েছিলাম। যদিও অযোগ্য মানুষের অভিযোগ প্রাত্যহিক তবুও অযোগ্যতা নিয়ে যারা জন্মে তারাও বাঁচার জন্য আস্ফালন করে, কর্ণের মত চিৎকার করে উঠতে চায়, দৈবায়ত্ত আমার জন্ম, আমার আয়ত্ত আমার কর্ম। লোকে হাসে। আমি-তুমি চেয়ে দেখি, করুণ দীর্ঘশ্বাস বুক ভেঙ্গে নেমে আসে। সোহাগের আশ্বাস খুঁজে বেড়াই ঐ অযোগ্যতার দাবীদারদের মত। নিয়তির চরম পরিহাস।

কতদিনই-বা পেরিয়েছে, আজও মনে হয় এইতো সেদিন! রাঙা চেলির আবরণে শ্যামাঙ্গ লুকিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে, এসেছিলে আশার মুকুলকে ফলবান করতে, এসেছিলে আনন্দ উচ্ছল জীবনের আস্বাদ খুঁজে পেতে, এসেছিলে কল্পনার স্বর্গ রচনা করতে,—এইতো সেদিন! তারপর,—ও কাহিনীতে আর নূতনত্ব নেই, পুরাতনের আবেশ শুধু বুক ফাটা আর্তনাদের মত ফেটে পড়তে চায়। তার চেয়ে শাহজাদা-শাহজাদী, বাদশাহজাদা-বাদশাহজাদীর কথা শোন। বাস্তবতার কঠিন পেষনে ভেঙে পড়া দেহ-মনকে বেদনার আরক দিয়ে ভিজিয়ে নাও, তিক্ত-মধুর-কষায় আস্বাদনে পরিতৃপ্তি পাবে।

মাথায় গামছা। পরনে হাঁটু অবধি গোটানো পাজামা আর শতছিন্ন কামিজে দেহ ঢাকা। বয়স!—তাহবে তিন কুড়ির ওপর। রিক্‌সার হাতল ধরে বেঁকে বেঁকে রোজই পেরিয়ে যায় আমার সম্মুখ দিয়ে।

রিক্সায় কোনদিন মানুষ সোয়ারী দেখি নাই, মাঝে মাঝে দু'মনী দু'একটা বস্তা বোঝাই থাকে। মালের ওজন তার কুব্জ দেহটাকে সোজা করে দেয়, গতি তার বৃদ্ধি পায়, সাদা দাড়ি বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ে পিচের কালো রাস্তায়, তারই উপর সে ক্লান্ত পা চেপে চেপে ছুটে চলতে চায়। খালি রিক্সার গতি শ্লথ, শ্লথ গতির সাথে বৃদ্ধও যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়। বোঝা তাকে কর্মী করে, গতি তার বৃদ্ধি পায়, কুব্জ দেহটা সোজা হয়ে উঠে, বোঝা না থাকলে ক্লান্তিতে সে যেন ভেঙে পড়ে।

নিরালায় পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার ?

ছেঁড়া কামিজের হাতা দিয়ে মুখ মুছে বৃদ্ধ সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, শাহজাদা।

সে হাসল। নিজের নামকে ব্যঙ্গ করেই বুঝিবা হাসল, হাসির তীব্র ঝলকে ঝল্‌সে গেল আমার দৃষ্টি। মনে হল, নামের গৌরব তার অঙ্গে নয়, হৃদয়ারণ্যে।

আমিও হাসলাম।

শাহাজাদা! ষাট বছরের শাহাজাদা, তক্তে-উ-তাউসে 'শাহ' হয়ে বসবার অবসর তার জীবনে হয়নি।

রিক্সার হাতলটা চেপে ধরে যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলতে থাকে। চলার পথ তার জীবনের সন্ধিক্ষণে কোন স্মৃতির আলপনা আঁকেনি, আপশোষ তার নেই, তাকিয়ে দেখবার অবসরও নেই।

তার গতিরোধ করে বললাম, দাঁড়াও।

কেমন বেমনা হয়ে আমার দিকে উদাসভাবে চেয়ে থেকে রিক্সার হাতল মাটিতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত কামাই কর রোজানা ?

দেড় দু'টাকা হুজুর, নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, আজকের মেহনতী।

ভিখ্ !

তার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, ভিখ্ নয়, মেহনতী। আজ তোমাকে নিরালায় পেয়েছি, এমনটা হয়ত আর পাব না। তোমার সাথে গল্প করবার বড় ইচ্ছে। তুমি কাহিনী শোনাও, আমি শুনব। এ হল সেই শোনাবার মেহনতী।

বৃদ্ধ বোধহয় আমায় পাগল মনে করল।

অপরাধ তার নয়, সবাই তাই মনে করে। চলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই মানুষ থমকে যায়। বিচার করে দেখবার আগেই জোর গলায় সার্টিফিকেট দেয় 'পাগল'। বৃদ্ধের জীবনে এমন কথা কখনও শোনেনি, শুনবার মত সুযোগ সুবিধাও সৃষ্টি হয়নি। রিক্সাওয়ালা, তাও মাল বয়ে যার দিন গুজরান হয় তারতো কোন কাহিনী থাকতে পারে না। তবুও বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসল। বলল, আমার কথা!

বললাম, হাঁ তোমার কথা, নিখাদ তোমার কথা।

বৃদ্ধের ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, হুজুর, বেহেস্তে হুরী থাকে, মাটির দুনিয়াতে হুরী মানায় না। জঙ্গলে বাঘ থাকে, শহরে-গাঁয়ে তার সুরত ভাল লাগে না। আকাশের চিড়িয়া পিঁজরায় হামাগুড়ি দেয়। তেমনি গরীবের গরীবখানায়, না বসলে,

বাধা দিয়ে বললাম, গরীবখানায় বসেই তোমার কথা শুনব। আসল-নকল চিনে নিতে পারব। চল, তোমার গরীবখানায়।

বৃদ্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শহরে শেষ কিনারায় কাঁসাইয়ের ডাঙ্গায় তার আস্তানা।

ঝুপ্‌রির পাঁচফুট উঁচু দরজার ভেতর দিয়ে নিজের দেহটা গলিয়ে দিয়ে ডাকল, আসুন হুজুর,—সামলে আসবেন।

তার সাবধানী কণ্ঠস্বর শোনামাত্র আমি থমকে দাঁড়লাম।

আমাকে সঙ্গচ্যুত দেখে বৃদ্ধ ফিরে এসে বলল. চলুন।

না থাক। বাইরেই বসব শাহজাদা।

বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ হল। ম্লান হাসি তার মুখে, হাসির মাধ্যমে ব্যথা গোপন করবার অদম্য চেষ্টা যেন ফেটে পড়েছিল তার অধরোষ্ঠে।

তবুও যেতে পারলাম না। খোলার জীর্ণ বস্তি, তারই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কামরার চেহারা কল্পনার চোখ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, বাস্তবরূপ দেখবার সাহস ছিল না।

বললাম, শাহজাদা।

হুজুর।

এইবার বল তোমার কথা।

আমার কথা,—বৃদ্ধ চাটাই পেতে বসতে দিল। এক কোনাতে সে-ও বসল বেশ নিরাপদ ব্যবধান রেখে।

তাগাদা দিয়ে বললাম, বল শাহজাদা।

বলছি।

শাহজাদা কি যেন ভাবল।

চিন্তার অতল খুঁজে মণিমাণিক্য বুঝিবা সে উপহার দেবে। কুঞ্চিত কপালে কতকালের বিষণ্ণ বিমর্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ। অপলক তার দৃষ্টি, আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তাগাদা দিলাম, বল শাহজাদা।

বলছি। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। তাকিয়ে দেখলাম, এ যেন সে শাহ্জাদা নয়।

"লাখনাউ, উঁহুঁ, বদায়ুঁ,—ঐ দিকে কোথাও ছিল ঘর। সুরু হল শাহজাদার কাহিনী।

"সে মুলুক আজও দেখিনি হুজুর। শুনেছি আমার মায়ের নানা এসেছিল সেই মুলুক থেকে; চুপিসারে পালিয়ে এসেছিল বরকতখাঁন, মেয়ে তার জিন্নতের হুরী। লড়াইতে ফাঁসী হয়েছে দামাদের, ফিরিঙ্গী তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে জঙ্গীবাজদের জরু-বিবি। বিধবা মেয়েকে নিয়ে বরকতখাঁন ছুটে আসল এইদেশে, গর্ভবতী মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে।

"আসগর আলি ছিল জোয়ান মরদ। বাদশাহী ফৌজের জমাদার। লড়াইয়ে ফতে হল হিন্দুস্থান, ফতে হল আজাদীর রোশনাই, গাছের মাথায় লাস ঝুলিয়ে দিল এংলেশরাজ।

"হুরীবেগমের কোলে এল আমার মা, সলিমা তার নাম। মায়ের নানা মরল, আমার নানি মরল, আসগর আলির বংশে রইল সলিমা, বয়স তার এককুড়ি পেরোয়নি।

"মায়ের কথা মনে ছিল না হুজুর, জ্ঞান হলে দেখলাম আমি রয়েছি এতিমখানায়। বার বছর বয়সে সেখান থেকে পালিয়ে ছিলাম। পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সকালবেলায় ভেজা ভাত আর নিমক, তুপুর বেলায় গরম ভাত আর পেঁয়াজ,—তুই খোরাক। সকালবেলায় শহরের রাস্তায় হাত পেতে বসতে হত, হাপুস চোখে কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা চাইতাম। প্রহরে প্রহরে এতিমখানার হাফিজ দারোয়ান এসে কেড়ে নিয়ে যেত ভিক্ষার কড়ি।

"তাও পালাতাম না হুজুর। হাফিজ দারোয়ান কসে কসে কান মলে দিত আর বলত, তোর মায়ের মত তোরও কুঠ হবে।

বলত, ভিক্ষের কড়ি চুরি করলে খোদার গজব হবে, কুষ্ঠ হবে। আমি কোনদিনই পয়সা চুরি করিনি হুজুর, তবুও কানমলা সহ্য করতে হত।

"আমাদের ইনুমিঞা বলত, শুধু শুধুই কান মলা খাস। যদি কানমলা খেতেই হয় তাহলে দু'চার পয়সা লুকিয়ে রাখিস না কেন। ইনুর বয়স বেশি, সে নাকি কলকত্তা ফেরতা। আমরা সবাই ইনুকে ভয় করতাম, সমীহ করতাম, তার বুদ্ধিকে তারিফ করতাম তবুও আমি চুরি করবার সাহস পেতাম না হুজুর। যারা দু'চার পয়সা এদিক-ওদিক করত তারাই দয়া করে মাঝে মাঝে দু' এক টুকরা তেলে ভাজা খেতে দিত।

"তবুও ভয় পেতাম। চোরাই পয়সার তেলে-ভাজা খেলে খোদার গজব পোহাতে না হয়। তখন খোদাকে ভয় করতাম। ইনুরা বলত, খোদা, ইয়া লম্বা চওড়া মরদ জোয়ান সাত দোজখের মালিক, বাহান্ন বেহেস্ত তার হাতে। মাঝে মাঝে মওলবী এসে মোনাজাত করত, আমিও করতাম। মওলবীর মত চোখ বুঁজে খোদাকে দেখবার চেষ্টা করতাম। ধীরে ধীরে ভয় ভাঙল, বুঝলাম, খোদাকে ভালবাসা যায়, ভয় করা যায় না।

'রাতের বেলায় মওলবী আসত, তালিম দিত। কাফেরী জবান নয় হুজুর, খাস মোছলমানী জবান শেখাত। যদি বলতে সামান্য ভুল হত তাহলে মওলবীর শুকনো কঞ্চির আমেজে পিঠের চামড়া ফেটে টপ টপ করে খুণ পড়ত।

"অনেকরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যেত বড়ে মিঞার কামরায়। এতিমখানার বড়েমিঞা সবার মালিক, চারবিবি ছয় বাঁদি। বাঁদিরা আমার মতই বাপ-মা-হারা এতিম মেয়ে, পেটের দায়ে, লাজের দায়ে আশ্রয় নিয়েছে। বয়সী মেয়েরা তাকে বাতাস করে, চোখে সুর্মা টেনে দেয়, কানে আতরের তুলো গুঁজে

দেয়। বুড়ে মিঞা তাদের আলাদা থাকতে দেয়। ঘুমের ঘোরে পা টিপতে বসতাম। মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, এতিমখানার বড়ে-মিঞা হতে পারলেই বুঝি জীবনের সব সাধ পূরণ হবে। আঃ—কি রোশনাই, বেগম, বাঁদি, আতর, খুসবাই, আজ আর সে সব কথা ভাবতে পারি না।

"পা টিপতাম। না টিপে উপায় নেই। টিপতে টিপতে ঝিমুনি আসলে বাঁদিরা কান মলে দিত। ওদের মাঝেও দু'একজন ভাল ছিল। হামিদাকে আমার খুব ভাল লাগত। হামিদা সবার চাইতে ছোট, বয়স তখন পনর ষোল। গায়ের রং মেটে মেটে, ছোট ছোট চোখ। প্রথম যখন দেখেছিলাম তখন ছিল দোহারা চেহারা। ক্রমেই সে রোগা হয়ে যেতে লাগল। সে মিষ্টি কথা বলত, আদর করত, বলত, শাজাদা ঘুম পেলে আমাকে বলিস। মাঝে মাঝে বড়ে মিঞার সানকি থেকে মুরগীর ছিবড়ে দু-এক টুকরো খেতেও দিত।

"সেদিন সেই ছিবড়ে মনে হত মধু। ঘুম পেলেও সামান্য খাবারের আশায় চোখের পাতা টেনে তুলতাম। হামিদা এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত, সে নিজেই পা টিপতে বসত। বড়ে মিঞা মাঝে মাঝে তার গালে দাড়ি বুলিয়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গেই হামিদার কালো মুখখানা রাঙা হয়ে উঠত হুজুর। সেদিন কি জানতাম হুজুর, আজ বুঝি।

"মাঝে মাঝে হামিদাকে দেখতে পেতাম না। অনেক দিন পরে একদিন হামিদা আসতেই বললাম, কোথায় গিয়েছিলি বুবু? হামিদা উত্তর দিল না, কাঁদল। হুজুর পাপ, শুধু পাপ! পয়সা, শুধু পয়সা। পয়সার লোভে বাঁদিদের পাঠিয়ে দিত জাহান্নমের দরজায়। বাজারের আলু পটলের মত হাত বদলি হত। সেদিন যা বুঝিনি আজ তা মর্মে মর্মে বুঝি।

"তারপরও অনেকদিন কেটে গেল। হামিদা ফিরে এল সন্তান কোলে নিয়ে। আমায় ডেকে বলল, শাজাদা, পালিয়ে যা। থাকিস না এখানে। কথা শেষ করেই হামিদা কেঁদে ফেলল। তার রুগ্ন দেহের কাঁপুনিতে কোলের ছেলেটাও আঁতকে উঠল। আমি ভয় পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"তারপর আর কোনদিন হামিদাকে দেখিনি। শুনেছি কোন মুলুকে তার সাদি হয়েছে। সেখানেই সে চলে গেছে। ভারি দুঃখ হল হুজুর। তবুও রয়ে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর!

বৃদ্ধ থমকে গেল।

"তারপর পালাতে হল। শুনেছিলাম পুলিশে হুলিয়া দিয়েছিল। কিন্তু ধরতে পারেনি। একরাত পায়ে হেঁটে সদর ছেড়ে তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে এলাম। ইমু কানে কানে বলেছিল, হামিদাকে গুম করছে বড়ে মিঞা।

"গুম! অর্থ না বুঝে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। আমাকে বোকার মত তাকিয়ে থাকতে দেখে ইমু বলল, আমি পালাব, তুইও পালা, নয়ত তুইও গুম হবি।"

"তাই পালালাম। সারা দুনিয়ার দরজা খুলে গেল চোখের সামনে, দুনিয়ার হিম্মত আর হেফাজতী বুঝতে বুঝতে দিন গুজরান হয়ে গেছে। খোদার গজবের হাত থেকে রেহাই পেলাম না।

"পথে পথে ঘুরে বেড়াই, কুঠো মেয়ে দেখলেই জিজ্ঞাসা করি তার নাম, কেউ বলে, কেউ খিঁচিয়ে উঠে। এমনি করে চারটে বছর কেটে গেল।

"সেবার আশমানে আগুন লেগেছিল হুজুর, রোদের তাতে দুনিয়া পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ী দেশের পাথরগুলো তেতে যেন লাল, পা দেওয়া যাচ্ছিল না। পটমদার কাঁচা

রাস্তা বেয়ে চলেছি, সামনেই গ্রাম, পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। ছুটে গেলাম গাঁয়ের কোলে। সামনের গাছতলায় বসেছিল একটি বয়স্কা রমণী। গাছের ডালে ঝিমুকি-ধরা কাক চোখ বুঁজে রয়েছে।

'রমনী' বললাম, কিন্তু তার আকার নেই, কুঠে হাত-পা খসে গেছে, বীভৎস চেহারা। সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম 'পানি পাওয়া যাবে?'

"সে উত্তর দিল, না।

"আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

"রুগ্ন মেয়েটা হেসে বলল এ গাঁয়ে সবাই কুঠো, পানি দেবে কে!

"তাজ্জব ঈশ্বরের সৃষ্টি। সারা গাঁয়ে একটিও সবল সুস্থ মানুষ নেই যে এক গেলাস পানীয় দেয়।

"পুরাতন অভ্যাসমত জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

"নাম! চুপকরে রইল। দু'তিনবার মাথা ঝাঁকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, নাম, ছোটবেলায় নাম ছিল সলিমা।

"তুমি সলিমা! চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, সলিমা, কোথায় তোমার ঘর? শাহজাদা কি তোমার ছেলে?— আরও অনেক প্রশ্ন করলাম।

রমণী উত্তর দিল না। রুদ্ধবাক নারীর মনের কথা ফেটে পড়ল তার অশ্রুধারে।

"আমি শাহজাদা!

"কথা শেষ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার বুকে। ভুলে গেলাম সে কুঠো। ভুলে গেলাম আমার অতীত জীবন। আঁকড়ে ধরলুম মাকে, মায়ের স্নেহকে।

"অন্তরালে বসে ঈশ্বর তার অক্ষম সৃষ্টির দিকে চেয়ে

হেসেছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু মানুষের জাত ঘৃণায় হেসে উঠেছিল। মানুষের কোলে ঠাঁই পেলাম না।

"তারপর ?

"নিয়ে এলাম তাকে শহরের কিনারায়,—এই ঝুপরিতে। চোখের জল ধুয়ে গেল কাঁসাইয়ের বানে, হাতে তুলে নিলাম রিক্সার হাতল। তারপর কত সাল-মাস পেরিয়ে গেছে, কাঁসাইয়ের বুকে চর পড়ছে, নতুন সোঁতায় তার ক্ষীণ স্রোত বেয়ে চলেছে, লোহার সাঁকো দিয়ে বাঁধা হয়েছে তার একূল-ওকূল। আজও হাত থেকে রিক্সার হাতল নামেনি, আজও সলিমা বিবি ক্লান্তি নিয়ে দিন গুনছে রোজ কেয়ামতের। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষিয়ে উঠছে ঝুপরির আঁধারী কোনা ঘুপচি!

"সলিমাবিবির এন্তেকালও হয়নি, আমার হাত থেকে রিক্সার হাতলও নামেনি। ভেবেছিলাম আমার কাহিনী সমাপ্ত করব আমার মাকে দেখিয়ে তা আর হল না। না দেখেছেন ভালই করেছেন। হাত-পা-নাক-কান বিহীন এক পিণ্ড মাংস, মানুষ বলে চিনতে পারবেন না হুজুর। দেখলে মানুষ জন্মের ওপর ধিক্কার এসে যেত।

"সকাল বেলায় মাকে খাইয়ে বের হই, বিকেলে ফিরে এসে রসুই করি, মাকে খাইয়ে নিজে খাই। ঘুমিয়ে থাকি মায়ের পায়ের তলায়।

"বিয়ে! তা বটে, এ কথা যে মনে পড়েনি এমন নয় হুজুর, কিন্তু কুঠ রোগ; মায়ের রোগে ছেলে মরে, ছেলের রোগে মরে নাতি। তাই বিয়ে করা আর হল না, আর—"

বৃদ্ধ ক্লান্তিতে থেমে গেল.

জিজ্ঞাসা করলাম আর

"আমার মা বলে, আমার বাপ ছিল শয়তান! সে-ই রোগ এনেছিল ওমনিধারা গাঁ থেকে, তা থেকেই রোগ এসেছিল মায়ের দেহে। লড়াইয়ের সিপাহী আসগর আলির মেয়ের দেহে কুঠ, এও কি সম্ভব। শপথ করলাম, এ রোগের শেষ করতেই হবে। মায়ের দুঃখ, বাপের পাপ সব কিছুর শেষ করব আমার জীবনে।"

বৃদ্ধের দেহটা ফুলে উঠল। অমিত কোন শক্তি তাকে যেন শক্তিময় করে তুলেছে। অপলকে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে।

কি দেখছেন হুজুর ম্লান হাসিভরা জিজ্ঞাসা।

না, কিছু নয়। উঠে দাঁড়ালাম।

চললাম শাহজাদা, আবার দেখা হবে।

আপ্যায়নের হাসিতে মুখ ভরিয়ে বৃদ্ধ সেলাম দিল।

ফিরে এলাম আস্তানায়।

বৃদ্ধের মুখের ছাপ আমার মনের মুকুরে স্থায়ী দাগ কেটে বসল। সারারাত ঘুমুতে পারিনি। এ-পাশ ও-পাশ করে বিছানাতে বসে বসে ভাবছিলাম, নেপোলিয়ঁ আর বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির চেয়ে এ মাতৃভক্তি কি কম!

উত্তর খুঁজে না পেয়ে পরদিন কর্মস্থানে এসে বসলাম।

নিত্যকার মত আজও শাহজাদা পেরিয়ে গেল। তেমনি শক্ত সমর্থ বৃদ্ধ, রিকসার হাতলে যেন হাত জুড়ে গেছে। মনে হল, একবার ডাক দেই, ডাকতে সাহস পেলাম না। তাকে দেখে ভয় হল, মনে হল, সলিমাবিবির শতায়ু যেন মানুষ জন্মকে ব্যঙ্গ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। কল্পনা নিথর হয়ে গেল, হিম শীতল হয়ে এল চিন্তারগতি, বাস্তব যেন মুখব্যাদন করে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। শিউরে উঠলাম।

কত শাহজাদা অতলে ডুবে গেছে, তার মত কত মানুষ বাঁচতে আর বাঁচাতে উপে গেছে দুনিয়ার বুক থেকে। সলিমার মত ভয়ঙ্কর বাঁচাকে আশ্রয় করে মানুষ আজও বাঁচার অহমিকায় মরনকে দূরে রাখতে চায়, মরন তাদের অপ্রিয়, এমন সুন্দর ধরণীর বুকে ভয়ঙ্কর বাঁচাও মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। আশ্চর্য্য। তুমি হয়ত এমন বাঁচাকে কল্পনাও করতে পারবে না।

শাহজাদা কখনও শাহজাদা হয়নি, তবুও অন্তর তার শাহজাদার অনেক উর্দ্ধে, জনতার স্রোতে শাহজাদা চাপা পড়ে গেছে, তাকে জানবার চেষ্টাও হয়ত কেউ করে না, তবুও, আজও যদি শাহজাদাকে দেখতে পাই তা হলে তার বিকৃত রূপ দেখতে পাবনা। বার্দ্ধক্যের কুঞ্চিত জীবন তার আপন হৃদয়ের সুষমায় ভরপুর রইবে চিরকাল।

তুমি ঘুমিও না। যদি ঘুমিয়ে পড়, এ ঘুম যদি না ভাঙে, আমার বলাতো শেষ হবে না। জেগে থেকে সজাগ প্রহরীর মত জীবনের সব কটা দিন পাহারা দিয়েছ, কঠিন বাস্তবকে রোধ করতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছ, জীবনধর্মের বিকাশ হয়নি, তবুও ক্লান্তিতো কোনদিন ছিলনা, আজ কেন ক্লান্তিতে শুইয়ে পড়ছ। জেগে থাক। জাগরণের বিমর্ষতাকে রোধ হয়ত করতে পারবনা, তবুও শেষের দিনেও সাময়িক অনুভূতিতো সৃষ্টি হবে। সেইটুকুই তো লাভ।

শাহজাদা!

শাহজাদীকে দেখনি কখনও।

দেখবার সুযোগও পাওনি। আমার প্রবাস জীবনের সাথে কতটুকুইবা তোমার পরিচয়, যেটুকু জাননা, সেটুকু জেনে নাও।

নাম তার আলপনা। রঙীন তার জীবন, রঙের নেশায় চোখের কোলে কালি, কাজল দিয়ে ভ্রূটানা। ট্যাঙা, তন্বী, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, ছিপছিপে গড়ন। নৃত্যন্তী চলন ছন্দ, কালো ভ্রূজোড়ার তলে মদির স্বপন। আকর্ষণ সৃষ্টি করবার মত তার চাহনি।

আমাকে সে ভালবাসে। আমাকে ভালবাসা তার বিলাস। আরও অনেককে ভালবাসলে বিশেষ অন্যায় হত না। তাকে ভালবাসবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু ভালবাসা কুড়িয়ে নেবার অবসর ছিল না তার নিজের। আমার বয়স ভাঙনের কিনারায়, রূপটা ছেঁদো, তবুও কেমন মমতা রয়েছে। তার বয়স? নাই বা শুনলে। মনে কর, আঠাশ তিরিশ। আজকের বয়স তো কালকে ছিল না, কালকে ছিল বিলাসের উপকরণ, সে বিলাসের প্রথম বলী আমি!

মাঝে মাঝে বলত, দুবেণী এলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা না করতে পারলে বড়ই আপশোষ থেকে যাবে।

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবে স্তাবককুল লাভ হত অনেক। বয়ঃসীমা ধর্তব্য নয়।

বলতাম, বেশ তো, টপাটপ নীচের তলার সিঁড়িগুলো পেরিয়ে নাও।

আহাম্মক তিনবার হোঁচট খায়, চারবারে হাঁটতে শেখে। তিনবার সে পিছলে পড়ল নীচের তলার সিঁড়িতে, আহাম্মুকীর ধাক্কায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি গোনা তার আর হল না। নীচের সিঁড়ি সব কটা পার হওয়া আজও শেষ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যে মনঃকষ্ট দিল তার শোধ তুলতে চাইলো বিয়ে করে।

বলল, বিয়ে করব।

বললাম, বেশতো। অনেকদিন ভোজবাড়ির নেমতন্ন খাইনি।

বাসরে। জেলাসি হবে না।

হবে বইকি। তবে তোমার নিজস্ব জেলাসিটা রুখতে পারবে তো?

আমার আবার জেলাসি কোথায়! একটু তাজ্জবে হয়ে উত্তর দিল।

মনে কর, ভালবাস আমাকে, বিয়ে করলে রামচরণকে। পয়সা আছে তার, বয়স আছে তার, রূপ হয়ত নেই। রূপ আছে নদের চাঁদের। পেতে চাইলে তাকে। ভালবাসা, পয়সা আর রূপ। এবার জেলাসি হবে কিনা, বল?

ধমকিয়ে বলল, চুপ কর।

সহ্য হচ্ছে না?

তুমি ভাবছ ঠাট্টা, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। বিয়ে আমাকে করতেই হবে তা করতে হবে অতি শীঘ্র।

আমাকে যদি রাইভ্যাল মনে না কর তা হলে একটা যুক্তি দিতে পারি।

অনায়াসে।

রূপকথার রাজা প্রতিজ্ঞা করল, সকালে উঠে যার মুখ দেখব তার সাথে রাজকন্যার বিয়ে দেব। তেমনি প্রতিজ্ঞা কর, 'কাল সকালে প্রথম যার মুখ দেখব তার সঙ্গে বিয়ে করব।' তাহলে বিয়েও হবে, তাড়াতাড়িও হবে।

শাহজাদী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

বলল, এটা তোমার নিজস্ব কথা, যুক্তি নয়। যুক্তিহীন মানুষের এই রকমই সাইকোলজি হয়।

সাইকোলজি, তা বটে।

শাহজাদী হার মানল না। যেন জয়ের গৌরবে আত্মহারা

হয়ে বলল, পড়াশোনা মোটেই হচ্ছে না। মনে হয় কি জান রূপকথার রাজপুত্র যদি পেতাম তাহলে তার কোলে মাথা রেখে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতাম।

এই চিন্তাধারাই তোমাকে পড়তে দেয় না।

বলেই হাসলাম।

বিরক্তির সাথে শাহজাদী বলল, হাসছ?

সেটাও কি অপরাধ?

তা নয়। আচ্ছা, আমার বিয়েতে তুমি কি দেবে?

কি দেব! ভানুমতীর বাক্স খুলে দেখতে হবে, কোন গোপনবস্তু সংগৃহীত হয়ে আছে কি না।

ক্ষুব্ধ হয়ে শাহজাদী বাসে উঠল, আমিও হেসে বিদায় নিলাম।

আরেক দিনের কথা। জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমায় ভালবাস কেন?

হেসে বললাম, কলম্বাসকে হার মানালে দেখছি।

তাহলে ভালবাস না?

কেমন করে বলব। ভালবাসার ডেফিনেশনটা জানা নেই। ভালবাসার লক্ষণ কি বল দেখি, মাথা কন্ কন্ করা,

থামো। গম্ভীরভাবে শাহজাদী আমাকে পেছনে ফেলে জোরে জোরে পা ফেলতে লাগল।

জোর কদমে তার পাশে এসে বললাম, রাগ করলে! বয়স কালে ভালবাসা রোগ বিশেষ, চিকিৎসা শাস্ত্রে দুরারোগ্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সামনে এসে ট্রাম দাঁড়াতেই শাহজাদী হাতল চেপে ধরল।

বাধা দিয়ে বললাম, থাম।

শাহজাদী হাতল ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়াল।

উত্তরটা আজ দিতে পারলাম না, তবে কেমন মায়া জন্মেছে

মনে হয়। এর বেশি চিন্তা কখনও করিনি ; করবার অবসরও পাইনি।

শাহজাদী রাগ করে ফিরে গেল। বিশাল অট্টালিকার কোন নিভৃতকক্ষে ফুলদানী তুলে নিয়ে হয়ত ড্রেসিং টেবিলের আয়না ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, হয়তবা বেলফুলের গোছা দিয়ে আমার মুখ তৈরী করে কোন পশুর মুখের সাথে তুলনা করেছিল, হয়ত বা গোঁসা করে অর্ধাহারে রাত কাটিয়েছিল, অত খবর রাখি না। ঐশ্বর্যের বিলাস যেমন তার ডেমন্সট্রেশনে, প্রেমের বিলাস তেমনি অস্থির মনোবৃত্তির ছটফটানিতে। শাহজাদী ব্যতিক্রম নয়।

শাহজাদী এল না।

এক মাস, দুমাস!

গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। পর্ণকুটিরে কোন মহাজন এসেছেন ভেবে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার গোড়ায়।

শাহজাদী নামল গাড়ি থেকে।

আমাকে দেখেই খিল খিল করে হেসে উঠল, সোৎসাহে বলল, কেমন আছেন দামোদর বাবু?

এতদিনকার দামোদর কি করে হঠাৎ 'বাবু' হল, ভেবে পেলাম না। ধনীর দুলালী, এও তার একটা বিলাস। চিন্তার অবকাশ নেই, মুখ উঁচিয়ে দেখি লাল টকটক করছে সিঁথি। সে প্রমোশন পেয়েছে, আমাকেও প্রমোশন দিয়েছে।

আমিও নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বললাম, আলপনা দেবী, নমস্কার। ভাল আছেন তো?

ভাল! কত যেন কৌতুক! সে শিশুর মত হেসে উঠল।

বলল, ল্যাঠা চুকিয়ে ফেললাম। আজকেই রেজিস্ট্রি করলাম।

খুশীর আতিশয্যে অনেক কিছুই হয়ত সে বলত, আমার প্রশ্নে সে দমে গেল, বললাম, কিন্তু এ গরীবের কুটিরে কেন? আপনার বাসর!

গর্জে উঠল শাহজাদী।

থামো। বেশি বয়সে মেয়েরা বিয়ে করে অবলম্বন পাবার আশায়।

কিন্তু আলপনা দেবী, অনেকে ভালুক নাচও দেখে থাকে।

শাহজাদী গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসল।

বলল, আজকেই সুব্রত এলাহাবাদে ফিরে যাবে, তার যাবার আগে সন্ধ্যেয় পার্টি। পার্টিতে আসলে খুশী হব।

এই অভাজনের মত আপনার খাতায় কজনের নাম আছে আলপনা দেবী?

উত্তেজিত ভাবে বলল, অসভ্য, ব্রুট।

খপ করে তার দরজার ওপর এলিয়ে দেওয়া হাত চেপে ধরে বললাম, রাগ করলেন?

শাহজাদী ধমকে উঠল, ছিঃ, সামনে ড্রাইভারকে দেখছ না। ওকি মনে করবে বল দিকি।

মনে করবে? যা মনে করবার। ভাইও হতে পারে। পুরানো প্রেমিকও হতে পারে।

রাবিশ। চললাম। এস কিন্তু।

শাহজাদীর গাড়ি বেরিয়ে গেল, শাহজাদীর কথার মতই গাড়ির বেগ।

পুরানো কথা মনে পড়ল।

দশবছরও পেরোয়নি। এমনি এক নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে চুপি চুপি এসে বলল, তোমার বুকিং অফিসের দরজা বন্ধ নইলে…

নইলে ঘোমটা টেনে গিন্নী হয়ে বসতে। কিন্তু শাহজাদী

ত্রিতল গৃহ থেকে বস্তীর এই নোংরা ঘরটায় সংসার জমত না। সংসার অসার মনে হত।

শাহজাদী ক্ষুন্নভাবে বলেছিল, অসার সংসারে তুমি মাত্র সার হতে।

তার সজল চাহনি হৃদপিণ্ডের চঞ্চলতা যেন স্তব্ধ করে দিল। মুখ তুলে কথা বলতে পারলাম না।

এই সেই শাহজাদী। জয়ের গৌরব, কি পরাজয়ের আচ্ছাদন তা বুঝতে পারলাম না।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি।

শুনেছিলাম, শাহজাদী সুব্রতের সাথে একদিনও ঘর করতে পারেনি। অভিমান কিম্বা দ্বেষ বুঝতে পারলাম না, তবুও যখন শুনলাম শাহজাদী ভারতের মাটি ছেড়ে ইংরেজের দেশে গেছে সে-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি গুনতে তখন দুঃখিত হলাম। মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি পেতাম, মোটামুটি পড়াশোনা এগোচ্ছে এইটেই ছিল বক্তব্য। সরল সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাঝেও তার করুণ জীবন যেন প্রতিফলিত হত।

একবার লিখল, কলেজ থেকে ফিরে বেড়াতে বের হই না।

কেন, সে কথা লেখেনি।

না লিখলেও ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

ফালগুনী সায়াহ্ন। ছোট বেলাটা এলিয়ে পড়েছে সোনালী আকাশের বুকে। বস্তীর ভাঙ্গা জানলাটা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যায়, সেই আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম। পাশের তেতালা বাড়ির ছাদে কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনেরা

হুল্লোর করছে। ওপাশে রাস্তার কলে বালতি টানাটানি চলেছে, তাদের কোলাহল মাঝে মাঝে কানে এসে আঘাত দিচ্ছে। তন্ময়তা এসে গেছে, এমন সময় পায়ে হেঁটে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল শাহজাদী।

চিনতে পার?

পরিচিত হাসি দিয়ে আপ্যায়নের সুরে বললাম, ভুলে যাবার অবসর দিয়েছ কি কখনও।

শাহজাদী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

বললাম, বিলেত থেকে নতুন এটিকেট শিখে এলে বুঝি।

শাহজাদী বোধ হয় জুতসই মত একটা উত্তর দেবার চেষ্টায় ছিল, বলবার অবসর না দিয়ে পাশের টুলটা টেনে বসিয়ে দিলাম।

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সব মিটিয়ে এলাম। সব ল্যাঠা চুকে গেল। স্বস্তির ভঙ্গীতে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

লেখাপড়ার হাঙ্গামা তো মিটল। বাংলা যার কৃতিত্ব স্বীকার করেনি, বিলেত তাকে কৃতিত্বের ছাপ দিয়েছে, এইতো আসল ল্যাঠা। আর?

আর সুব্রত।

তার আবার কি হল?

ডিগ্রী নিয়ে এসেছি। পাশের ডিগ্রী আর বিচ্ছেদের ডিগ্রী।

আহা বেচারা।

বেচারা!—ভণ্ড অসৎ—শাহজাদী ফুঁপিয়ে উঠল।

তা হলে তাকে ভালবাসতে?

কস্মিনকালেও নয়।

তবে কাঁদছ কেন?

নারীত্বের অবমাননায়, এ বুক ফাটা ক্রন্দন নয়, ক্রোধের অভিব্যক্তি। শাহজাদী রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

ভেবেছিলাম বিয়ের ল্যাঠা চুকিয়ে দেই, দেখলাম বিয়ের ল্যাঠা বিয়ে করে চুকানো যায় না, বিচ্ছেদ দিয়ে চুকানো যায়।

আমি নিরুত্তরে তার কথা শুনছিলাম, সে আবার বলল, আগের দিনে চিরকুমার আর চিরকুমারীকে লোকে শ্রদ্ধা করত, আজকে কেন করে না জান?

বললাম, জানি, কিন্তু তোমার মতের সাথে হয়ত মিলবে না। আজকের দিনে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ দেখলেই মনে হয় দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। আগের যুগে মানুষকে অর্থনীতির চাপে পড়ে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সত্যকে বঞ্চনা করতে হত না, আজকের দিনে বেকারত্ব আর দারিদ্র মানুষকে এই শাশ্বত ধর্ম থেকেও বঞ্চনা করছে।

বাধা দিয়ে শাহজাদী বলল, বিবাহিত জীবনের ধরা বাঁধা নিয়মে মানুষ আজ থাকতে চায় না। তাই...

এসব সুলতানী যুগের কথা আজকের কথা নয়। ভোগকে ধর্মের অনুশাসন দিয়ে পবিত্র করা হত যে যুগে, সে যুগে এ নৈতিক ব্যভিচার সম্ভব ছিল। আজকের দিনে নয়।

শাহজাদী বিতর্কে অংশ গ্রহণ না করে কুঁজো গড়িয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার ভাল হয়ে বসল।

তোমার এখানে থাকব।

অনুরোধ নয়, আদেশের মত তার কণ্ঠস্বর। বললাম, নারী হরণের দায়ে আদালতে হাজির করতে চাও বুঝি!

বললাম যে ডবল ডিগ্রী পেয়েছি।

অনেকক্ষণ তার কঠিন কঠোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে

বললাম, মোগলের হারেমে তোমার শোভা বৃদ্ধি পেত আলপনা। বাঙ্গালী ঘরের চাল চলনের সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে বোধ হয় পারবে না। পিতার পরিত্যক্ত ঐশ্বর্যে পরগাছা হয়ে থাকবে, জ্বলবে ঐ হারেমের শাহজাদীর মত, শান্তি পাবে না।

শাহজাদী কাঁদল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, তোমার ওপর শোধ নিতে গিয়েই আমার এত বড় পরাজয়। তবুও—

তবুও কিছু পাওনি। পাবেও না। সারা জীবন একক ভাবে রূপ রস গন্ধহীন শুকনো ঝরা পাতার মত পথে বিপথে ফিরতে হবে, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, আমাকে বুঝি ভাল লাগে না।

হাসলাম। বললাম, গ্র্যাণ্ড হোটেলের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক সময় তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, এখানে থাকলে বেশ ভাল হত। কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? তোমাকে ভাল লাগলেও আপন করে নেবার সঙ্গতি নেই। আমি যে রিক্ত। দেবার যার নেই, নেবার অধিকারও তার নেই। অধিকারহীন গ্রহণ ভিক্ষার নামান্তর। তার উপর…

তার উপর?

নীতিগত বিরোধ রয়েছে তোমার সাথে। তুমি ধনীর তুলালী, ধনের মোহ তোমার রয়েছে, আর আমি সর্বহারা, আমার সে মোহ থাকা অপরাধ। তুমি তো জান, সামন্ত মনোবৃত্তি সম্পন্ন পরিবারে জন্মেছি, সেই পরিবেশে বড় হয়েছি, কিন্তু সেই মনোবৃত্তিকে ভালবাসতে পারিনি। ভাল বাসিনি বলেই আজকে এই বস্তীর নির্মম আবেষ্টনীতে নিজেকে টেনে আনতে বাধ্য হয়েছি।

শাহজাদী ফিরে গেল।

কয়েক মাস পরে হঠাৎ পশ্চিম থেকে চিঠি পেলাম, কোন মেয়ে কলেজে অধ্যক্ষার পদ নিয়ে চলে গেছে। সাদর আহ্বান জানিয়েছে, সে দেশটা যেন বেড়িয়ে আসি।

চিঠির উত্তর দেব দিচ্ছি করেও দেওয়া হয়নি। এই নৈতিক অপরাধ থেকে আমাকে বাঁচাল তার ছোট্ট একখানা চিঠি। চিঠিখানায় সে লিখেছে:

মোগল হারেমের শাহজাদীরাও বোধহয় আমার চেয়ে সুখী ছিল। তাদের ক্ষমতা ছিল ভোগের, ভালবাসার নয়। আমার কোনটাই নেই।

শাহজাদীর আগমনও নিষ্ক্রমণ তো শুনলে, এবার বলব, প্রত্যাগমন ও পরিণতি।

শাহজাদী ফিরে এল।

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে রক্ত বসন।

হাতের ঝোলা থেকে কম্বলের আসন বের করে মেঝেয় পেতে বসল।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এমন বেশ কেন?

কোথাও শান্তি নেই দামোদর। তাই সব ছেড়ে নিষ্কাম সাধনা করব ভেবেছি। করুণ তার কণ্ঠস্বর।

বড়ই বেসুরো লাগল, বললাম, এ ভেবেই বুঝি ভেক নিয়েছ ভিখ পাবার আশায়।

ভিখ পাইনি সারা জীবনে, ভেক ছিল না কোন দিন। এত সাজগোজের তলায় আলপনার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু শাহজাদী মরতে চাইছে না। শাহজাদীর মরণ কামনা করেই এ ভেক নিয়েছি।

গম্ভীরভাবে ডাকলাম, শাহজাদী।

কিছু তত্ত্বকথা শোনাতে চাও বুঝি!

না। তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় কত দিনের? তের-চোদ্দ বছর হবে নয় কি? এই দীর্ঘ দিন ধরে তুমি কি ভেবেছ, কি তোমার বাস্তব পরিচয়, তার খতিয়ান করেছ কখনও?—করনি। কি চাও? কি চাও না? —তার হিসাব করেছ কি কখনও? হিসাব করলে দেখতে পাবে লাভের আশায় শুধু দাদন দিয়েছ, একটি কড়িও ফিরে পাও নি। এইতো মনুষ্য জীবনের পরিচয়।

শাহজাদী অসন্তুষ্ট ভাবে বলল, নীতিকথা আমি শুনতে চাই না। সহস্রের শিক্ষিকা আমার বৃত্তি কিন্তু সেই সহস্রের অংশীদার হতে আমি রাজি নই। মুক্ত বিহঙ্গমের মত ডানা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছি, উড়ন তুবড়ির মত ফোঁস করে উঠেই ভুস করে নেমে এসেছি। ব্যারোমিটারের পারদের সাথে উঠা-নামা করে শান্তি পাই নি। ঘর বেঁধে সুখের আলয় পেতে চেয়েছি, তাও পাই নি। শাহজাদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যারা ঘর বাঁধে তারা নিজের ঘর আগে ভালবাসে, তারা অপরের ঘরকে মর্যাদা দেয়। সে মর্যাদা তুমি দিতে চাওনা নিজের ঘরকেও কোনদিন সত্যিকারের ভালবাসনি।

শাহজাদী নীরবে আমার কটূক্তি শুনল, কথা বলল না, প্রতিবাদ করল না। আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ডাকলাম, শাহজাদী।

শাহজাদী চমকে উঠল।

ইংরেজীতে trust বলে একটা কথা আছে জান!

জানি।

Trust রক্ষা করবার trustee আমি। তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি অকৃত্রিম ভাবে, সেই ভালবাসা মহনীয় করে তুলুক

তোমাকে আমাকে, কিন্তু trusteeর কাজ থেকে এক চুলও যেন বিচ্যুতি না ঘটে। এই কি আমাদের কামনা নয়?

শাহজাদী কাঁদল না, অনুযোগ করল না। আনন্দের আতিশয্যে উত্তেজিত হয়েও উঠল না। ধীরে, অতি ধীরে তার স্বভাবসিদ্ধ চপলতাকে রোধ করে বলল, বার তের বছরের জমানো ব্যথা আজ শেষ হল।

শাহজাদী ধীরে ধীরে উঠে গেল। প্রাসাদে ফিরে গেল।

এবার যেদিন এল, সেদিন আর রুদ্রাক্ষের মালা নেই, রক্ত বসনও নেই। কেমন উদাস তার চাহনি। বড়ই ভাল লাগল তাকে। ধ্যানগম্ভীর শুভ্রতা তার মুখে; নিশ্চিন্ততার আবেশে স্নিগ্ধ। বসতে দিয়ে স্টোভ জ্বালালাম। চা করে দিলাম। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, এটা তোমার কাজ নয়, আমার।

তবুও তুমি অতিথি।

অতিথি! মুক্তার মত চকচকে অশ্রুকণা ভেসে উঠল তার কপোলে।

দাবী নেই, যা দাবী সে অতি ঠুনকো। মুখের আর মনের কথা। কাগজে আঁচড় কাটা নেই, সমাজের বুকে আঁকা নেই।

মাথা নীচু করে বসে রইলাম। উত্তর দিতে পারলাম না। মনে হল, নিত্যকার সহচর নয় অথচ চিরজীবনের সাথী সে। আঘাত যেন বেশি আপন করে তোলে। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না মনের কথা।

কি ভাবছ?

বললাম, ভাবছি তোমাকে।

আরও একটু বেশি করে ভাব দেখি। মনে করছি চাকরি নিয়ে অনেক দূরে চলে যাব।

মন্দ কি !

থমকে গেল শাহজাদী, চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, এই কি তোমার মত ?

নির্বিকার ভাবে বললাম, আমার মতটাই কি প্রবল ?

অন্তত আমার বিষয়ে দুর্বল নয়।

এমন নির্ভরশীলতাকে আঘাত দিতে পারলাম না। বললাম, পরে ভেবে বলব।

শাহজাদী ফিরে গেল।

অনেকদিন তার সাথে দেখা নেই।

আকস্মিকভাবে খবর পেলাম শাহজাদী হাসপাতালে।

দেখতে গেলাম। কেবিনের মাঝখানটায় লোহার খাট, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, শাহজাদী এলিয়ে রয়েছে তার কোলে। রোগ পাণ্ডুর মুখ, তবুও শীর্ণ নয় দেহ, কুঞ্চিত নয় মুখরেখা, রুগ্ন নয় তার চাহনি।

ইসারায় ডেকে বসতে বলল।

পাশে বসতেই আবেগের সাথে বলল, এবার peace in exchange of death—অপার শান্তি। চাইনি তো কিছু, যাবার বেলায় ভিক্ষে দিয়ে যেও। বড়ই নিঃস্ব, বড়ই দীন।

সান্ত্বনার সুরে বললাম, অসুখ হলেই বুঝি সবাই মরে।

জানিনা। মন বলছে, নিরাশার শেষ হবে, আশার ক্ষীণ প্রদীপ ঠুনকো বাতাসে নিভে যাবে। তাই মিনতি জানাচ্ছি।

দমে গেলাম। নিজের কাছে নিজের কৈফিয়ত দেবার মত কোন ছেদ রাখতে চাইনা। বললাম, বল কি চাই !

কানে কানে বলব। মাথা নীচু কর। আরেকটুকু। হাঁ, এইবার ! একটা চুমু এঁকে দাও আমার কপালে।

বলতে বলতেই সে কর্ণমূলে সশব্দে চুম্বন দিল। সোহাগের আবেশে বলল, কৈ দাও।

আমি নিজের অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করছি। এমন সময় ঝঙ্কার বেজে উঠল, কাপুরুষ। এতে trust নষ্ট হয় না। মন যা চায় দেহ তা করে না। অক্ষমতা নীতির মাপকাঠি নয়। মনের দিক থেকে যদি trust নষ্ট না হয় দেহের trust তাতে কোন সময়ই নষ্ট হয় না, হবে না।

কেমন অসার হয়ে গেল স্নায়ুসন্ধি, মাথার ঘ্রাণ নেবার মিথ্যা অজুহাতে অধরোষ্ঠ তার কপালে ছুঁইয়ে দিলাম। কেমন প্রশান্তিতে সে এলিয়ে পড়ল। জীবনের সব সাধ বুঝি তার পূর্ণ হল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুঁজে এল।

ডাকলাম, শাহজাদী।

ইঙ্গিতে থামতে বলল, তবুও ডাকলাম, শাহজাদী।

করুণ কণ্ঠে বলল, এই পরশটুকু মনে রাখবার মত অবসর দাও দামোদর। এত সোহাগ সইবে তো। দীর্ঘশ্বাস নেমে এল তার বুক ভেঙ্গে।

পৃথিবীর সব শাহজাদী আর শাহজাদা হৃদয় বৃত্তিতে এমন ধারাই ভিখারী, আবার এমন ধারাই তারা ঐশ্বর্যবান। এই বিপরীত হৃদয় ধর্মের অপূর্ব সমাবেশ আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়, এত দেখেও পরিতৃপ্তি নেই।

আমার প্রতিবেশী, অতি নিকট প্রতিবেশী। পেশা চিত্রাঙ্কন। চিত্রশিল্পী ভদ্রলোককে গভীরভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করতাম। তার কথাই বলব।

সাহিত্য আর শিল্প আহার্য জোগায় না, বিশেষ করে আমাদের দেশে। বাস্তব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে শিল্পী, মনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সাহিত্যিক। এমন দুইটি স্রষ্টাও অনাহারে মরে আমাদের এই হতভাগা দেশে। কৃষক স্রষ্টা, সেও অনাহারী; স্রষ্টা কলের মজুর, সেও অনাহারী; স্রষ্টা হস্তশিল্পী, সেও অনাহারী।

সৃষ্টি সমাদৃত, স্রষ্টা অনাদৃত। আমাদের এই আজব দেশের আজব ব্যবস্থা। রূপান্তরকার রূপান্তরিত হয় রূপহীনে।

কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যাকরণগত অর্থাৎ আমাদের গঠনগত। আমাদের প্রতিবেশীও ব্যতিক্রম। অর্থবান নয়, তবুও অর্থ তাকে বঞ্চনা করতে পারেনি। চাল চলনে, হাব ভাবে উন্নাসিক ভাব। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় সে, এ ধারনা তার পেশাগত, বলতে গেলে মজ্জাগত।

তবু চমৎকার ব্যবহার।

সব ব্যবহারের ওপর কালো অনুচ্ছেদ তার গৃহগত জীবন। গৃহে প্রত্যাগমনের সাথে সাথেই তার চেহারা বদল হয়ে যেত। কিছুক্ষনের মধ্যেই তার উচ্চ কণ্ঠস্বর, আর নারীকণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি বিষিয়ে তুলত আবহাওয়া।

অন্যান্য প্রতিবেশীর দল উত্যক্ত হয়ে উঠল। তারা প্রতিবাদ জানাল।

তাদের বিরোধী ভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে একদিন শিল্পী-গৃহিনী অমিত তেজের সাথে বলল, আমার সোয়ামী আমাকে মারে, তাতে অন্যের কি! আপনাদের শালিস করতে কে ডেকেছে ?

বলবার অনেক কিছু থাকলেও সবাই নিরুত্তরে ফিরে এল।

শুনে হাসলাম। দিনের বেলায় প্রাণ খুলে হাসতে পারিনি। রাতের বেলায় আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হো-হো করে হেসে উঠলাম। বিচিত্র মনুষ্যারণ্যে শিল্পী-গৃহিনী চমকপ্রদ নয়, কিন্তু যখন মাতৃসদন থেকে বছর বছর নতুন সন্তানকে বুকে করে ফিরে আসেন তখন মনে হয় বিচিত্র। 'তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক হোক।'—ঋষিবাক্য। হাজার হাজার বছর

আগে ঋষিরা জ্ঞান চক্ষুতে দেখেছিলেন যা, যা সত্য নয় তাকে সত্যবলে প্রচার না করলে আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, তাই এই আপ্তবাক্য। নীতিকথার মত আউরে চলি, তার সারাংশ ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে সেই ঋষিদের যুগেই, আজকে শুধু তা বেঁচে আছে ফসিলের মত। এ-হৃদয় ও-হৃদয় এক হয় না কোন দিনই।

শাহজাদীকে এই কাহিনীটা বিনিয়ে বিনিয়ে বলেছিলাম। নাসিকা কুঞ্চন করে সে বলল, ক্রুট, অসভ্য।

তবু সত্য। ক্রুট অসভ্য ব্যবস্থাই সারা দুনিয়ার মাপকাঠি। ওরা আছে বলেই তো তোমরা সভ্য হতে চেয়েছ ও পেরেছ। নাক সিঁটকে থেকনা। ইতিহাস আরও সম্ভাবনাপূর্ণ। এবার ওদের যবনিকা টেনে দিচ্ছি।

উদ্‌গ্রীব ভাবে শাহজাদী বলল, মেয়েটা বুঝি মরে বেঁচেছে!

মরে বাঁচেনি। বেঁচেছে রক্তের টানে। বাহ্যত তারা স্বামী-স্ত্রী, গোত্রে তারা মামাতো পিসতুতো ভাই বোন। রক্তের টানে ছটফটানি রয়েছে। অত্যাচার অনাচার ভ্রাতা ভগ্নীর প্রীতির নিদর্শন। বাকিগুলো গৃহী জীবনের পুরস্কার। অতএব সমস্যা আপনা থেকে সমাধান প্রাপ্ত হয়েছে।

শাহজাদী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে শাহজাদী চলে গেল দার্জিলিং।

চিঠি পেলাম। আরোগ্য নিকেতনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শেষ করে মন্তব্য করেছে, বিজ্ঞান মরতে দিতে চায়না; কিন্তু বাঁচতেও দিতে চায় না। বাঁচাটা খুঁড়িয়ে চলা বুড়ো বলদের মত। সারা জীবনের পরিশ্রান্তির পরিণাম। কিন্তু সেই সারা জীবন আমাদের কয়েক প্রহরেই অতীত হয়, জীবন ধরে খুঁড়িয়ে চলাই সার হয়।

শাহজাদীকে জবাবী চিঠি লিখলাম।

তুমি ঘুমিও না। চিঠির নকল তুলে রেখেছি। প্রত্যাশায় বসে আছি, শাহজাদী যদি কোন দিন ফিরে আসে, চিঠিখানা হাতে তুলে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেব অতীতের অতি নির্মম অথচ তুচ্ছ এই ঘটনাকে। শাহজাদী শৈলাবাস থেকে আর এ শহরে ফিরে আসেনি। অনেক দূরে চলে গিয়ে চিঠি দিয়েছে। তাকে লেখা আমার চিঠিখানা শোন।

লিখলাম, শাহজাদী,

বাঁচার বিড়ম্বনা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারাই বাঁচে। আর যারা সত্যিকার বাঁচতে চায় তারাই পড়ে ফাঁকিতে। তোমার বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্য নয়। তবুও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মানুষের জীবনে এমনি ধারা চলে আসছে পর্যায়ক্রমে আবহমান কাল।

তোমার চিঠি পড়েই মনে হল বাদশাহজাদাকে। তার কথাই বলব তোমাকে।

তার আগে শুনে রাখ, পয়সার বিনিময়ে যে সেবা আর স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় তার প্রকাশ বিরাটত্বের দাবী করতে পারে না। তোমার বিপুল ব্যয়ের অঙ্কের হিসাবে তাদের সেবার প্রচেষ্টায় মেকী স্নেহ সৃষ্টি হয়েছে, আসল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

রাগ করনা। যদি বস্তুর বিনিময় হয় হৃদয় সেখানে শুকিয়ে যায়।

যাক সেকথা। তুমি নীরোগ হয়েছ, এই আমার আনন্দ। এবার শোন বাদশাহজাদার কথা।

বাদশাহজাদা, বাদশাহ নয়। বাদশাহী তার নেই, কোন কালেই ছিল না। আমার দেওয়া নাম মাত্র।

তার বাপ মায়ের দেওয়া নাম অনিলেন্দু।

বাপের কিছু জমিদারী ছিল।

অর্থাৎ পরগাছা।

বাদশাহজাদা সখের ব্যবসায়ী, দুখানা গাড়ি, রঙ্গীন শাড়ি, কোনটারই অভাব নেই।

নিজেও গুণী লোক।

বাদ্যযন্ত্রে সে ওস্তাদ। ডুবু ডুবু সূর্যকে অভিবাদন জানায় সেতার বাজিয়ে। আকাশের অরুণিমাকে প্রণাম জানায় গীটার বাজিয়ে।

সব ছাড়া সম্ভব হলেও এ অভ্যাস ছাড়া সম্ভব হয় নি। নিত্যকার কার্য পঞ্জীতে কোথাও লাল কালির ঢেঁড়া নেই। এমনি নিষ্ঠা তার কার্যক্রমে।

অতি ভোজনের কৃপায় পেটটা সে দিন অভদ্রতা করছিল, সেতারের তাল কেটে যাচ্ছিল।

বাদশাহজাদা চিৎকার করে উঠলেন, রাঘব।

রাঘব খাস খানসামা।

ছুটে এসে দাঁড়াল।

মোহন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি বাবুর পেট কামড়াচ্ছে।

রাঘব ফিরে আসবার আগেই পেট কামড়ানি থেমে গেছে, বাদশাহজাদা সেতার ছেড়ে এসরাজের কান মোচড়াচ্ছে।

অতি বিশ্বস্ত খানসামা প্রভুকে কান মোচড়াবার সুযোগ দিয়ে সকৌতুকে স্থান ত্যাগ করল। নিজের কানটা বাঁচাবার দায় রয়েছে তার।

আবার পেট কামড়ানি সুরু হল।

এসরাজের কান থেকে হাত নামিয়ে বাদশাহজাদা হাঁকলেন, ননীলাল।

বাদশাহজাদার বংশধর ননীলাল।

পিতার আদেশ পাওয়া মাত্র সেও মোহন ডাক্তারের সন্ধানে বের হল।

ননীলাল খবর নিয়ে এল, মোহন ডাক্তার শীগ্‌গীর আসছেন।

বাদশাহজাদার তখন খবর শোনবার অবসর নেই, এসরাজ তখন উচ্চাঙ্গের সুরে মেতে উঠেছে। তার সাথে বাদশাহ-জাদাও মেতে উঠেছে। সুরের ঝাপটায় পেট কামড়ানি থিতিয়ে গেছে।

এসরাজের ছড়ি থেমে গেল। বাদশাহজাদা ডাকলেন নিত্য।

নিত্য বাজার সরকার। প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্র সেও ছুটল ডাক্তারের খোঁজে। বাদশাহজাদা গীটার তুলে নিলেন হাতে।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই নিত্য ফিরে এল। সাথে এল ডাক্তার।

সোল্লাসে বাদশাহজাদা চিৎকার করে উঠল, আরে ডাক্তার যে, কি মনে করে?

ডাক্তার অবাক!

সামলে নিয়ে বলল, তোমাদের এদিকে এসেছিলাম, দেখা করে গেলাম। সবাই ভাল তো?

ভাল, নিশ্চয় ভাল। তোমার মত ধন্বন্তরী যে দেশে সে দেশে ভাল না থেকে কেউ পারে। বস, বস। তোমার বউদি ছানার পোলাও করছে, একটু মুখে দিয়ে যাও।

আজকে মাপ কর। তা তোমার শরীর···

ওহো—হো। মনে পড়েছে। পেট কেমন কামড়ে উঠল বার কয়েক। বুঝতে পারছি না। ভাবছিলাম তোমার কাছেই যাব।

ডাক্তার হাঁকলো, বউদি।

পাশের ঘরে বেগমসাহেবা পোলাও নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তারের চেনা গলা শুনে ছুটে এলেন। ডাক্তার ততক্ষণ বাদশাহজাদার পেট টেপা সুরু করেছে।

মুখ বিকৃত করে গম্ভীরভাবে বলল, গ্যাসটিক আলসারের লক্ষণ।

বেগমসাহেবা চমকে উঠলেন। তা হলে!

তা হলে আর কি, সাতদিন জল বার্লি আর লেবুর রস। রাঘবকে পাঠিয়ে দেবেন ওষুধ দিয়ে দেব।

বেগমসাহেবা তখুনি পরিচর্যায় লেগে পড়লেন। পড়ে রইল তাঁর ছানার পোলাও। এত বড় বিপদের সম্ভাবনা, পতিব্রতা নারীর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর মানত করলেন মা কালীর কাছে। শুরু হল পরিচর্যা।

ডাক্তারখানা থেকে এল তিক্ত জোলাপ। বাদশাহজাদার পায়ের জল আর শুকোয় না। তিন দিনে বাদশাহজাদা বিছানায় মিশে গেল।

বেগমসাহেবা সকালে বিকেলে ডাক্তারখানায় লোক পাঠান, পরিচর্যার উপদেশ নেন, আর ভাবেন, এ যাত্রা বাঁচলে হয়।

বাদশাহজাদা ভাবে, একি পরাভোগ!

ডাক্তার ভাবে, কেমন জব্দ।

বাদশাহজাদা বুঝতে পারল তার দুরবস্থার কারণ, ডাক্তারকে মিনতি জানাল, এবার মাপ কর ভাই, তোমার বউদিকে একটু পারমিশন দাও নইলে আর বাঁচি না।

ডাক্তারদের সময়ের মূল্য আছে জানো?

সব জানি, এবাকার মত মাপ কর।

বাদশাহজাদা ভাত খেয়ে বাঁচল, বেগবসাহেবা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ডাক্তার বাঁচল উট্‌কো আবদার থেকে।

একটা নিরেট বেভুল লোকের কাহিনী বলছি। এই পরিণতি-তেই মানুষের জীবনে যদি যবনিকা আসত তা হলে খুশী হতাম।

কিন্তু তা হয়নি। জানো শাহজাদী, পরগাছার জীবনে যখন ধাক্কা আসে তখন ধাক্কা সামলে উঠতে সে পারে না, সে রকম মনোবলও তার থাকে না। ধনীর গৃহে শিশু শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেয় গৃহশিক্ষকের হাতে, যে দিন গৃহশিক্ষক আসেন না, সে দিন শিশুরাও পড়তে বসে না। এমনি ভাবে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বাল্যকাল থেকে, বড় হয়েও তারা জীবনের পাঠ্য তালিকা বুঝে নিতে পারে না। এই নির্ভরশীল মানুষদের সাথে বসবাস করলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বাদশাহজাদার শত কাহিনীর এইটি একটি মাত্র কাহিনী। হাস্যকর অথচ বাস্তব। অথচ করুণতম জীবনের মাঝে এসে যেদিন তাকে দাঁড়াতে হল সেদিন তার সম্বল ছিল শুধু ঘুণ-ধরা সমাজের অহমিকা।

তারই এই বেভুলপনা আমার কাছে খুবই ভাল লাগত। মাঝে মাঝে বলতাম, আপনি বৈঠকী লোক। মধ্যযুগের শরাব শাকীর দেশে আপনাকে মানাত ভাল। আজকের যুগে বড়ই অচল।

একদিন এসে বলল, কিছু দিতে পারেন ভাই?

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম বেলা বারটা বেজে গেছে, অথচ স্নান খাওয়া তখনও তার হয়নি।

পকেটে সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা ছিল তাই তুলে দিলাম।

অনুভব করলাম, এত বড় বাদশাহজাদা ভূমিতে গড়িয়ে পড়েছে।

একদিন বললাম, ব্যবসাটা মজ্জাগত না হলে ব্যবসায়ী হওয়া যায় না অনিলবাবু। জমিদারী চালানো আর ব্যবসা চালানো এক নয়!

ব্যবসার ঋণ মেটাতে পিতার দান হস্তান্তরিত হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। আজ তাকে হাঁড়িতে জল দিয়ে চাল খুঁজে বেড়াতে হয়।

এও নিয়তি!

হাত জোড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নিজকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ব্যবসা বলুন আর জমিদারী বলুন, সবই কপাল। এক জীবনে দু লক্ষ টাকা উড়িয়েছি। জীবনে মদ ছুঁইনি, পর নারীর দিকে কু-নজর দেইনি অথচ টাকাতো উড়ে গেল। একেই বলে ভাগ্য!

হাসলাম।

জান শাহজাদী, আমার হাসির সাথে করুণার অভিব্যক্তি ছিল না, ছিল শুধু সান্ত্বনার আক্ষেপ।

একদিন বিকেলে বাউড়িপাড়ায় তাকে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এ পাড়ায় কেন?

কাল থেকে ঝি আসেনি, ঝি খুঁজতে এসেছি।

পাশ কাটিয়ে এলাম।

সংসার অচল অথচ দাসী না হলে সংসার চলে না। আহার্য নেই অথচ উপকরণের অভাবও অসহ্য।

সাধারণ নির্বাচনের সময় দেখতাম সামনের কয়েকটি বাড়ির বেকার ছেলেরা ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে ভোট ভিক্ষা করছে।

জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল, চাকরি দেবে বলেছে, না দিলেও এখনতো নগদা-নগদ পয়সা পাচ্ছি।

চাকরি তারা পায়নি, পাবেও না কোন দিন। তারা কর্ম্মমুখী

হলে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে বেড়াবার লোক থাকবে না। কিন্তু কালীপূজা দুর্গাপূজায় ঝাণ্ডার মালিককূল মোটা হাতে এদের চাঁদা দেয়। ঘরে চাল কিনবার পয়সা না থাকলেও মাইক বাজাবার পয়সার অভাব হয় না। স্বীকৃত-বেকার জীবনে পরের শান্তি ভঙ্গের পরোয়ানা তাদের হাতে। নগদা-নগদ পকেট খরচ আসে। বুভুক্ষু না হলে পশু বিশেষ যেমন শিকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে না, তেমনি বেকার না থাকলে এরাও ঝাণ্ডা ঘাড়ে ওঠায় না। ক্ষমতালিপ্সু কায়েমি স্বার্থের যারা বাহক তারাই বেকার সৃষ্টি করে। বেকারত্ব জৈবিক প্রয়োজনের মূল উৎপাটন করতে পারে না বলেই বেকারের দল স্বার্থন্বেষীর খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়। সংসার অচল হলেও চাকচিক্যের মাধ্যমে বাহ্যত সচল থাকবার ভঙ্গী সৃষ্টি করে। কর্মহীনতা কর্মের প্রতি ধীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এরা অ-কর্মকেই কর্ম বলে স্থির করে, সমাজে অনাচার সৃষ্টি করে। অন্নের অভাব ঘটলেও পানীয়ের অভাব এদের হয় না।

বাদশাহজাদার ঘরে চাল না থাকলেও ঝি থাকে। পরণে কাপড় না থাকলেও মেয়েদের স্বর্ণাভরণ থাকে। এই আধা অভিজাত শ্রেণী গোপন পথে সুরঙ্গ কাটে, এরা গোপনে মর্যাদা বিক্রি করে, আফগান ব্যাঙ্কে দাসখত দেয় তবুও মেহনত দিয়ে জীবন গড়ে তোলে না। ঐ বেকারদের মত পরের পয়সায় আধা আভিজাত্য রক্ষা করে, হিসাব করে না এই পয়সার বিনিময়ে তারা কি হারায়।

যে দিন তাদের আঘাত আসে সেদিন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পেশাগত অপরাধীর চেয়েও কঠিন অপরাধ অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেনা। বিবেক তাদের মৃত, হৃদয় তাদের স্নেহশূন্য, বৃত্তি তাদের পশুর চেয়েও হীন প্রমানিত হয়।

একদিন হঠাৎ এসে বলল, দামোদর বাবু, আমাকে রক্ষা করুন।

হাসলাম।

হাসছেন?

রক্ষার ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক, কত চাই বলুন?

নগদ পয়সা চাইনা দামোদর বাবু। বাদশাহজাদা কেঁদে ফেলল। আমিও বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম।

এত বড় বংশ, সব গেল, সব গেল,। রাক্ষসী জন্মেই মরল না কেন!

কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

ফিস ফিস করে বাদশাহজাদা যা বললেন তার বিশদ ব্যাখ্যা আর করতে চাই না। শিউরে উঠলাম! বললাম, নরহত্যা! বলেন কি!

কিন্তু আমার ইজ্জত, আমার সমাজ।

চুলোয় যাক আপনার ইজ্জত আর সমাজ। অক্ষমের কোন সমাজ নেই, ইজ্জতও থাকতে পারে না। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল সারা দেহ। তীব্র কণ্ঠে বললাম, আপনার সাথে অনেক দিনকার পরিচয়, বোধহয় কিছু কমনীয় অনুভূতি রয়েছে আমার, নইলে আপনাকে পুলিশের হাতে দিতাম।

আমার এই বিপদ।

বিপদকে বিপদ মনে করেই মানুষ লড়াই করে। হীন কর্মপন্থা দিয়ে বিপদকে জয় করা যায় না। যার সন্তান আপনার কন্যা বহন করছে, তার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করুন, এতে আমি সাহায্য করতে পারি।

সেও অসম্ভব।

ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, সম্ভব শুধু সন্তানকে হত্যা করা। বেরিয়ে যান, নইলে বল প্রয়োগ করে বের করে দেব।

অনিলেন্দু বেরিয়ে গেল।

যে চেয়ারটায় সে বসেছিল তাতে এক বালতি জল ঢেলে দিলাম। পবিত্র হোক কাষ্ঠাসন।

তুমি প্রশ্ন করবে, কে অপরাধী? আমি বলব, অপরাধী কেউ নয়। শাহজাদী, নয়নের মোহ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটায়। রাজা বাদশাহের স্বপ্ন না দেখে যদি মেয়ের শুভ রুচিকে সম্মান করতে পারত, অথবা দুর্দৈব থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পিতামাতা গ্রহণ করত, তাহলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। হামেশাই যেসব অপ্রীতিকর অবস্থা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, সেই অপ্রীতি থেকে আমরা রেহাই পেতাম।

মানুষের সহজাত বৃত্তি পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে চলে, তাই অতি সহজে ও সংক্ষেপে নীতিহীনতার আবেদন পৌঁছায় তাদের হৃদয়ে। এমন একদিন ছিল যে দিন সন্তান পিতার পরিচয় দিতে পারত না। সেই পিতৃপরিচয়হীন পিতৃপুরুষদের আমরা বংশধর। অথচ পিতৃপরিচয়হীন ভ্রূণকে আজ হত্যা করবার বৃত্তি আমাদের মধ্যে জেগেছে। যে সন্তানের পিতৃপরিচয় দিতে পারে না, সন্তানের মাতৃত্বকে যে স্বীকার করতে পারে না সে অবোধ, তার ওপর ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক।

সেই রাতেই রাধা এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

উদ্‌ভ্রান্ত তার চেহারা, রাঙা রাঙা চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ, সেই বর্ষণকে উপেক্ষা করে রাধা এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাধা তুমি এত রাতে?

রাধা হাসল। হাসি নয়, যেন মাতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা অগ্নিশিখার মত চমকে গেল।

কাকাবাবু। রাধা থমকে গেল, ফুঁপিয়ে উঠল, বলল, আমাকে বাঁচান।

তাকে বসতে দিলাম। শুকনো তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার বাবা আজ এসেছিলেন। তাঁর কথায় বলতে হয়, তোমাকে বাঁচাতে তিনি চান না, তিনি চান না তোমার সন্তান বাঁচুক। তিনি চান ইজ্জত আর সমাজ বাঁচাতে। ইজ্জত আর সমাজের কাছে তোমাদের দু জনকে বলী দিতে চান।

রাধা কথা না বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও তুমি?

কি চাই? আঁচলে চোখ মুছে রাধা সোজা হয়ে বসল। অনেক কিছু চাই! সন্তান চাই, স্বামী চাই, ভালবাসা চাই। কিছুই তো পাইনি, পশুর কামনার কাছে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে অভিশপ্ত মাতৃত্ব শুধু পেয়েছি। এবার আপনি বাঁচান।

বললাম, আমি যে নিরুপায়।

আপনিও আশ্রয় দেবেন না? হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল রাধা।

সমস্যা আশ্রয় নিয়ে নয়, সমস্যা জীবন মৃত্যুর। এ সমস্যায় আমি নিরুপায়। সাময়িক আশ্রয় তোমাকে দিতে পারি কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। যে পথে সমাধান সে পথে বহু বিঘ্ন। সামাজিক মর্যাদায় তোমার বাবা সে পথে পা হড়কে পড়ে গেছেন। তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে সবল মন নিয়ে। অন্যায়কারীকে দণ্ড দিয়ে।

রাধা কাঁদল।

তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুতে আগ্নেয় গিরির মত অগ্ন্যুৎপাত যে কেন ঘটল না তাই ভাবছিলাম। চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে ধ্বনিত হল, আমি যাচ্ছি।

রাধা মিলিয়ে গেল আঁধারে। এক ঝলক বিদ্যুতের মত মতই সে মিলিয়ে গেল।

ক দিন পরে খবর পেলাম, রাধা পাগল হয়ে গেছে। শুধু চিৎকার করছে, আলো নিভিয়ে দাও, অন্ধকার চাই, আলো চাইনা।

আলো নিভে গেল এক দুরন্ত বাদল রাতে। কাঁসাইয়ের বানে ভেসে গেল তার জীবনের আলো-আশা-আকাঙ্ক্ষা। দু দিন পরে বালির চড়ায় তার মৃতদেহ আবিস্কৃত হল।

জানিনা, সত্যিই রাধা স্বেচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল কিনা।

বাদশাহজাদার ইজ্জত আর সমাজ বাঁচাল।

শোন শাহজাদী, আদর্শের বালাই যাদের নেই, ফুঁকো আভিজাত্য যাদের মেরুমজ্জায় তাদের পরিনতিকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। তোমার মত ব্যর্থ শাহজাদীর অভাব জগতে নেই। বাঁচার চেয়ে বাঁচার অভিনয় বেশি মনোরম, তবুও এমন বঞ্চিত রাধার সংখ্যাও কম নয়। তাদের ভালবাসতে পারবে কি কখনও? ওরা যে ভালবাসা পাবার কাঙ্গাল।

এই চিঠি পড়ে, তুমি হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

আমি হাসব।

হাসব, কেননা, রাধার সান্ত্বনা তোমার বুকে লুকিয়ে রয়েছে।

তুমি বলবে, অমানুষ।

আমি বলব, হয়ত তাই। মানুষ অমানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ আজও হয়নি। হলে বুঝতে পারতাম। মনুষ্যত্বটা মনে হয় আভিধানিক কথা।

এইতো ক বছর আগে আমি তুমি পথ চলছিলাম।

সার বেঁধে লরী বোঝাই বিসর্জ্জনের সরস্বতী প্রতিমা যাচ্ছিল। ওমনি ধারা একটা লরী থেকে ছুঁচো বাজি ছুড়ে মারল আমাদের গায়ে। ভাগ্য ভাল, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি কিন্তু তুমি মন্তব্য করেছিল, কি অসভ্য ওরা।

সে দিন যা বলেছি, আজও তাই বলছি।

সে দিন বলেছিলাম, আনন্দের পূত উৎসব ওদের সামনে রুদ্ধ, জাগ্রত তারুণ্য ওদের ব্যভিচারী করছে, রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিয়ে অন্যের আশঙ্কা ও অশান্তি বৃদ্ধি করে ওরা ভিখারী হৃদয়ের ক্ষতিপূরণ করছে। সমাজের সুস্থ চিন্তা ধারার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেবার লোকের অভাব ঘটেছে।

মনুষ্যত্ব কেঁদে বেড়াচ্ছে, ওরা মৃত মনুষ্যত্বের শব সাধনা করছে।

শাহজাদীর চিঠি ডাকে দিয়ে রোজই ভাবতাম, এই বুঝি কঠিন সমালোচনা পূর্ণ জবাব আসছে। জবাব এল কঠিনও নয়, শীঘ্রও নয়। অনেক দিন পরে তার সুদীর্ঘ চিঠি পেলাম। ওকি তুমি ঘুমোচ্ছ যে, ঘুমিও না, ঘুমিও না। এই সবে রাত এগারোটা, আরও ছয়টা ঘণ্টা 'জাগতে রহো'। দুঃখ রজনীর একটি রজনীর স্মৃতি বুকে এঁকে নাও ; আজকের মত ভুলে যাও অতীত জীবনের উত্থান পতনকে।

শাহজাদীকে এ জীবনে পাশে খুঁজে পাব কি না সন্দেহ রয়েছে। বার-তের বছর ধরে ধীরে ধীরে হৃদয়ের কোনে যে আসন সে গড়ে তুলছে তাকে সম্মান না করে পারিনি, কেমন যেন দুর্বল মনোবৃত্তির আবেশ রয়েছে তার জন্য।

বাদশাহজাদার কথা যখনই মনে হয় তখন শিউরে উঠি, সমাজ বিবর্তনের যুগে এদের স্থান কোথায়। আজ যে নয়া সমাজের স্বপ্ন দেখছি, যে নয়া সমাজের বুনিয়াদ আজ গড়ে উঠছে সেও কি স্থান গড়ে নেবে পূতিগন্ধময় সমাজের বুকে। সেদিন অচল সংসারে স্বর্ণাভরণের আধিক্য দেখলে প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র প্রশ্ন করবে। শ্রম বিমুখতাকে আইনের কশাঘাতে শ্রমমুখী করবে। পরনির্ভরশীলতাকে ঘৃণা করবে। সেই দিন সেই যুগে

প্রশ্নোত্তরে এসে দাঁড়াতে না পারলে এই বাদশাহজাদার দলকে ধ্বংস অবধার্য বলে মেনে নিতে হবে।

শোন শাহজাদীর পত্র।

শাহজাদী লিখেছে, দামোদর, তোমাকে চিঠি দেওয়া হয়নি, জানান হয়নি অথচ হঠাৎ দিল্লীতে আসতে হয়েছে। বাহাত্তর ঘণ্টা এখনও পার হয়নি। বাহাত্তর ঘণ্টায় যে নেশা চোখে লেগেছে, তিন বছরেও লণ্ডন সে নেশা জাগাতে পারেনি। মনে হয়, লণ্ডন দিল্লীর তুলনায় অতি তুচ্ছ স্থান। এত বড় নিরন্ন দেশে যে এত জৌলুস তা আগে জানতাম না। চোখ ধাঁধিয়েছে, মন ভারাক্রান্ত হয়েছে।

লণ্ডনের জৌলুসের বাস্তব দিক রয়েছে, দিল্লীর জৌলুস যেন কৃত্রিম। রোগ পাণ্ডুর দেহকে বেনারসি রেশম-জড়ির শাড়ী পড়িয়ে বিদেশী লিপষ্টিক দিয়ে রঙ্ করা দিল্লীর সাধারণ চেহারা।

এ তোমার ঐ বাদশাহজাদার দেশ। সংসার অঙ্গন সারা ভারত জুড়ে, সেখানে হাঁড়িতে জল দিয়ে চাল খুঁজতে হয় অথচ দাসী রয়েছে, স্বর্ণাভরণ রয়েছে বাদশাহজাদাদের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। হৃদয় তাদের দৈন্যে ভরা।

কিসের বিনিময়, এরাও তা জানে না। কি যে খরিদ মূল্য তার হিসাব করবার লোক নেই। কেউ প্রশ্ন করছে না, করবে কি না সন্দেহ। বিমানে গোলাপ আসে, আতর আসে খোরসান থেকে , চুরুট আসে হাভানা থেকে, সব চেয়ে বড় জিনিষ আসে ফরাসীদের আঙ্গুরের ক্ষেত থেকে। এর মূল্য জোগায় কে ?— তুমিও জান আমিও জানি।

নতুন যারা আসে, উচ্ছ্বাসে তারা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের অর্ধসুপ্ত মনের কোনায় ধনের যে নেশা তা অন্ধের চটকদারিতে তৃপ্ত হয়। অন্তত ঘ্রানে অর্ধভোজনের মত তারা খুশী হয়। সুখী হতে পারে না। সকাল বেলায় কঠিন বাস্তব অর্ধসুপ্ত মনের

ওপর ব্যথার প্রলেপ টেনে দেয়। সংসারের রাধার দল যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন অর্ধভোজনের পরিতৃপ্তি লোপ পায়

বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের চবুতরায় দাঁড়িয়ে আজ দুপুরে, যমুনা দেখছিলাম। "নীল যমুনা"—পাথরের সেতু তার বুকে, ছুটছে বাষ্পীয় রথ, ছুটছে মানুষের মিছিল, যমুনা কুলু কুলু ধ্বনিতে বেয়ে চলেছে পায়ের তলায়। সে তমাল কোথায়, কোথায় সে বাঁশরী!

যাই বল, সারা দিল্লীতে ঐ যমুনাই আমার কাছে এখন অবধি সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে। পাথরের বুক কেটে কবে এ দরিয়ার স্রোত নেমে এসেছে তা রয়েছে অজানা। জানা রয়েছে হিন্দু মুসলমানের রাজা-বাদশা ঐ যমুনাকে আশ্রয় করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে তুলেছে দিল্লী, নয়াদিল্লী, ইন্দ্রপ্রস্থ, শাহজানাবাদ আরও কত নামের দিল্লী শহর। এই নগরীর আশে পাশে, আনচে কানাচে, ভেতরে বাহিরে কত অশ্রু, কত ষড়যন্ত্র, কত হিংসা, কত পাপ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, তবুও যমুনা নীল নির্মল, সাম্য, সুন্দর। কালিমা ধুয়ে নিয়ে চলেছে আবহমানকাল।

ইতিহাসের বুকে যমুনার এ কাহিনী কেউ লিখে রাখেনি, রঙমহলের রোশনাই লিখেছে, ফরুকসিয়ায়ের মত হতভাগাদের অকাল মৃত্যুর কথা লিখেছে, লেখে নাই যার স্নেহ ধারায় গড়ে উঠেছে, ভেঙ্গে পড়েছে দিল্লীর ইতিহাস। আনদৃত যমুনা কেঁদে কেঁদে বেয়ে চলেছে। সেই তমাল তলে শ্যামও নেই, নেই সেই গোচারন ভূমি, যমুনার খর স্রোতে দাগ রেখে যেতে পারেনি কেউ।

জুম্মা মসজিদের সিঁড়িতে বসে ভাবছিলাম, হিন্দু মুসলমানের পীঠস্থান এই দিল্লীর আসল রূপ কি। বিন-কাশিম এসেছিল,

মুসলমান ফকির-পীর, যীশুর বরপুত্রদের দলও এসেছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতার সাথে আরও দু একটা যোগ বিয়োগ করতে হিন্দুরা রাজি ছিল। যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজ ও কৃষ্টি গড়ে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু তা হয়নি। এই যৌথ প্রচেষ্টা আর উদার দৃষ্টি ভঙ্গীকে আঘাত দিল তুর্কী-পাঠান সাম্রাজ্যবাদীর দল। ভাঙ্গল হিন্দুর মন্দির, গড়ল মসজিদ; ভাঙ্গল শাসিতের হৃদয়, গড়ল শাসকের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য। ইট পাথর জোড়া দিল, কিন্তু নয়শত বছরেও জোড়া লাগল না হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ধর্ম। শাসকরা মানুষের কাছ থেকে দূরে রয়ে গেল। যে সময় পশ্চিম দেশে রাজাকে লোকমতের দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছে সে সময় ভারতে সামরিক শাসন চলছিল. লোকমতকে শাসক কখনও মূল্য দেয়নি। পরিনামে ভেঙ্গে পড়ল ব্যক্তি স্বার্থের সৌধ। সাম্রাজ্য-বাদীদের এ শিক্ষা ভারতের মানুষ আজও ভুলতে পারেনি।

অথচ এই শিক্ষায় নিজেদের গঠন করতেও কেউ পারেনি। আজও তারা ধর্মকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বুকে আঘাত হানছে। কি তাদের সম্বল! নেই সম্বল, রয়েছে ক্ষীণ যুক্তি। আজও তারা মুহ্যমান। তবুও অক্ষম যুক্তির শেষ নাই।

ধর্মটাই কি যুক্তি? সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম হল অস্ত্র। অজ্ঞ মানুষের সামনে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে শোষন ও পেষন তাদের জীবিকা। তাই ভেঙ্গে পড়ল বুনিয়াদ; পাথর রইল, প্রাণ রইল না। সংঘাতে, অন্তত নব যুগের সংঘাতে তাই ধ্বসে পড়ছে ধর্মবাজদের বঞ্চনার নীতি।

সোজা ফিরে এলাম। রাস্তার রূপা ও রূপসীর চকমকানিতে চোখ ঝলসে গেছে। শুধু শাড়ী, নইলে সবটাই ধার করা সম্পদ। বাকিটা নোংরা রুচির এ্যাডভারটাইজমেন্ট।

ফিরে এসে লিখতে বসেছি। লিখছি বসে বিনয়নগরের ছোট কামরায় বসে। বিনয়নগর, সেবানগর, মাননগর শান-

নগর, চাণক্যনগর—অনেক নগরের দেশ এই নয়াদিল্লী। সমাজ-বাদী রাষ্ট্রের রাজধানীতে অর্থের কৌলিন্যে নগর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এমন ভাবে মার্কা দেওয়া শ্রেণী বিভাগ হিন্দুর বর্ণাশ্রমে দেখিনাই, তুর্কী-মোগলের ইতিহাসে নেই।

একটা গল্পে পড়েছিলাম, 'পনর টাকার বউ'। পনর টাকা দিয়ে কেনা হয়নি সে বউকে। গোটা বাড়িটার সব চেয়ে কম ভাড়ার ভাড়াটিয়া নৃত্যলালের বউ—পনর টাকার বউ। ভাড়াটিয়া রাজ্যে তার স্থান সবার চেয়ে নীচুতে। চল্লিশ টাকার বউ নাক সিঁটকে কথা বলেন তার সাথে।

এখানেও মাননগরের মানুষের জাকজমকের তুলনায় বিনয়-নগরের মানুষেরা মাটির প্রদীপের মত টিম টিমে। তারা আবার রেস দেয় সেবানগরের মানুষদের সাথে। বেচারা সেবানগরের মানুষদের টেক্কা দেবার মত অবস্থা নয়, প্রতিবাসীর সাথে কোঁদল করেই তারা আপশোষ মেটায়।

শাননগরের শানদারদের দিল্লীর হোটেলে-বারে বেশি পাবে রাতের বেলায়, দু চার জন মানদার গিন্নীকেও দেখতে পাবে। বিনয়নগরের আটপৌরে গিন্নীর দল বছর শেষে মাতৃসদন ভিজিট করেই সুখী, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ঐ খানেই শেষ।

সেবানগরের অধিবাসীরা সব চেয়ে মর্যাদার লোক। তুমি যেন মনে করনা, Public Servant শাসকরা এখানে বসে দেশ ও জাতির সেবা করেন। এখানে বাস করে আর্দালী আর পিওন।

বিনয়ের অবতার কেরাণীকুল অধ্যুষিত অঞ্চলে বসে আছি, যাক আর বলে কাজ নেই।

কাল যাব মোগল গার্ডেন-এ। শুনেছি সেবাব্রতী রাষ্ট্রশীর্ষের এই বাগিচা শাহজানকেও লজ্জা দিয়েছে। বিনয়নগরের

গিন্নীরা বড়ই নিন্দুক। তারা কেন যে কপালকে মেনে নেয়না তাই ভাবছি, তা হলে মোগল গার্ডেন,আর শানদার মানদারদের সৌভাগ্যকে কেউ হিংসা করতে পারতনা।

ভাগ্য এসেছিলাম, নইলে জীবনের অনেক কিছুই অজ্ঞাত থাকত, অজ্ঞতার স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, মানুষকে জানতেও পারতাম না।

ঘুমিও না।

বিবির কথা শুনতে শুনতে নিশুতি এসে যাবে, তখন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে দুজনেই ঘুমোব। সকালের কঠিন বাস্তবের সাথে লড়াই করবার আগে নতুন করে উৎসাহ সংগ্রহ করব।

শুনলেতো, শাহজাদীর মন বদলেছে।

ভেবেছিলে কখনও ভারতের শুকনো হাড়ে বিলাসের স্রোত এমনিভাবে বেয়ে চলবে। তাও সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই বিলাসের অর্থ যারা দেয় তারা নীরবে অশ্রুপাত করে, একবার সাবধানী তিরস্কারও জানায় না। যারা পিষ্ট হয় তাদেরই নমুনা বিবি।

বিবি আমার দাসী, আমার নয় প্রতিষ্ঠানের দাসী।

সকাল-বিকাল ঘর পরিষ্কার করা তার কাজ। আমার স্থলাভিষিক্ত যিনি ছিলেন, তিনি বেতন ধার্য করেছিলেন মাসিক এক টাকা। আমি এসেই তার বেতন বৃদ্ধি করলাম ছয় টাকায়।

সামান্য কাজের মূল্য ছয় টাকা। সহকর্মীরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

বললাম, ঐ সামান্য কাজটুকু তোমরা করে নাও না কেন,

তা হলে তো এক পয়সাও ব্যয় হবে না। যে গৃহে বাস করব তার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব যার সে পাবে মাসে একটাকা আর বায়স্কোপের বদ্ধপ্রেক্ষাগৃহে তিনঘণ্টা বাস করে, বিষাক্ত আবহাওয়াতে থেকে মূল্য দাও পাঁচসিকে।

তার প্রতিবাদ করে বলত, ওটা সেই পরিতৃপ্তির মূল্য।

অর্থাৎ সারাদিনের কাজের পর পরিচ্ছন্ন গৃহে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে তোমার পরিতৃপ্তি পাওনা বলে তার মূল্য কম!

এরপর তারা তর্ক করেনি। আমার মেঠো যুক্তির কাছে ওদের শাস্ত্রীয় যুক্তি অচল, অন্তত পদমর্যাদার খাতিরে ওরা যুক্তির শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করতে ইতস্তত করত।

একদিন বিকেলে একজন বন্ধু এলেন, ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। বহু বাক্যালাপের পর বললেন, এই রকম রিস্ক নিয়ে বাইরে বাইরে দিন কাটান অথচ লাইফ ইনসিওর করেননি।

লাইফ বোধহয় নেই।

তা নয়, আপনার পরিবার পরিজনদের ওপর কোন মমতাও নেই।

হাসলাম।

হাসির কথা নয়, সবদেশেই মানুষ লাইফ ইনসিওর করে নিজেদের স্বার্থে, আমাদের হতভাগা দেশে লাইফ ইনসিওর করতে অনুরোধ করতে হয়।

বললাম, আমাদের হতভাগা দেশ বলেই লাইফ ইনসিওর করতে হয়, ভাগ্যবানদের দেশে লাইফ ইনসিওরের দরকার হয় না।

এত টুকু ঘরোয়া কথা যে গুরুতর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে বন্ধুবর তা মোটেই ভাবতে পারেন নি। মনঃক্ষুন্ন হয়ে

বলল, আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এই কাঠামোতে এর বেশি নিরাপত্তা আশা করা কি সম্ভব।

তাইতো বলছি। মিশ্র রাজনীতি আর মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তির নিরাপত্তা কোন কালেই থাকে না, তাই লাইফ ইনসিওর দরকার, এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ দরকার। জানেন তো ভাই, মিশ্র মানেই ভেজাল। জেনে শুনে ভেজাল স্বীকার করে যখন নিয়েছি, তখন নিরাপত্তা অস্বীকার করেই তা করেছি। পরিবার পরিজনদের প্রতি মমতা আমার কেন, আমার পোষা বেড়াল-টারও রয়েছে। ওকথা জীবনকথা নয়, সভ্য সমাজে ওটা অচল কথা।

বন্ধুবর উঠে গেলেন।

ঝাড়ু হস্তে বিবি প্রবেশ করল। জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কি রাঁধলে বিবি?

মুঠোর মধ্যে ঝাঁটা আঁকড়ে ধরে বিবি বলল, লইসা নাই বাবু।

বিবির শ্বশুরের নাম পয়সা। তাই সে পয়সা বলে না, লইসা বলে।

অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বললাম, সকালে বললে না কেন?

অপরাধীর মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কাকে বলব, আর কতই বলব। সবই কপাল, বাবু সবই কপাল।

অতি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট তার শেষের কথা কয়টি। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম তার শালীনতা জ্ঞান রয়েছে।

বিড়ির মজুর তার স্বামী। দিনান্তের উপার্জন এক-দেড় টাকা, তাও বন্ধ। বেশি মজুরী দাবী করেছিল অনাহারী শ্রমিক, আহার্যপুষ্ট মালিক কারখানায় তালা বন্ধ করেছে। বেকার স্বামীপুত্রের আহার্য সমস্যা নিয়েই বিবি বিব্রত। কপাল!

তা বটে! অনাহারের কোন ব্যাখ্যা আজও ভোগীদের অভিধানে লেখা হয়নি। কপাল না থাকলে মানুষ অনাহারকে নিশ্চয়ই মেনে নিত না।

একটি টাকা হাতে দিয়ে বললাম, চাল কিনবে।

শুধু চাল। ডাল নয়, উপকরণ নয়, শুধু চাল। এর বেশি বলবার মত অবস্থাও আমার নয়, এর বেশি প্রত্যাশাও ওরা করে না। দেড় সের চাল কিনে তিনজনের দুবেলার ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে এইটেই যথেষ্ট।

মহাজন বাক্য, প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী। আমাদের দেশে তাই আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন উপায় যা দিয়ে অনাহারীর সন্তোষ বিধান করা যায়। পেটের খিদে মুখের মধু দিয়ে ঢেকে দাও, ভাষণ দাও, বাণী দাও, মহাজন বাক্যের উদ্ধৃতি দাও, নতুনের আশা দাও, নইলে ওরা কপাল মেনে চলবে না, একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সেদিন লইসাহীনের দল টুকরো টুকরো করে ফেলবে বঞ্চক সমাজকে।

লইসা নাই, কার আবেদন? সহস্র? না, লক্ষ? না, কোটি কোটি কণ্ঠের করুণ ক্রন্দন। বিবিকে ভালবেসে ফেললাম। বিবিকে মনে হল সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ। লইসাহীনের সাক্ষ্যবহনকারী, অবোধ জননীর আক্ষেপবহনকারী নারী ও মাতার মমতাবহনকারী—বিচিত্র সমাবেশ, একটি নারীতে সহস্র নারীর চিত্র। ঐ আবেদনপূর্ণ হৃদয়কে ভালবেসেছি। ভালবাসা যেন আমার দান নয়, তার প্রাপ্য। বিশ্বের মানুষ মাত্রেরই সে ভালবাসা দাবী করতে পারে।

ভাবতে পারলাম না এর পরিসমাপ্তি কোথায়।

বিবি বলল, তুমি নাকি চলে যাবে?

কে বলল!

স্যাজো বাবু।

তাতে তোমার কি ?

নতুনবাবু আসলে যদি কামে নাই রাখে।

বললাম, অসম্ভব নয়।

বিবির চোখ সজল হয়ে উঠল।

সান্ত্বনার সুরে বললাম, যাতে তোমার চাকরি থাকে তার ব্যবস্থা করেই যাব।

ছয় টাকা বেতনের চাকরি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ উত্তীর্ণ, জগত এগিয়ে চলেছে, শুধু পিছিয়ে রয়েছে ওরা, তাই এত মায়া, তাই তার আকুতি। ছয় টাকা ওদের অনেক টাকা।

ডাকলাম, বিবি।

কেন বাবু ?

তোমার নাম বাঁদি না রেখে বিবি কে রেখেছিল ? বোধহয় তোমার জন্মের সাথে ব্যঙ্গ করেছে।

বিবি হয়ত কিছুই বুঝল না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জ্বল জ্বল করছে তার কপালের সিঁদুর, চক চক করছে হাতের লোহা। চেয়ে দেখলাম অনিমেষ নয়নে। ভাবলাম, ব্যঙ্গ যদি না-ই হবে এর জবাব কোথায়। পিতামাতার ধনপ্রবন মন দারিদ্রের মাঝেও স্বপ্ন দেখে। তাই নাম রাখে গুছিয়ে গুছিয়ে। পিতামাতার দল হয়ত ভাবে 'মরা মরা' বলতে বলতে একদিন রাম নাম বের হবে। বিবি-বেগম-রাণী নাম রেখে তারা সান্ত্বনা পায়। হয়ত কোন দিন তাদের বিবি-বেগম-রাণী সত্যকার বিবি-বেগম-রাণী হয়ে সমাজে স্থান গড়ে নেবে। রাণী এলিজাবেথ তো আশারাণীর মত আশাহীন নয়। আশা-হীনা রাণীর দল রাণীত্বলাভের মোহ ছাড়তে পারে না।

বিবি ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

এদের লাইফ কেউ ইনসিওর করেনি, করবেও না। একদিন

সবার অজান্তে বিবির বাঁদীগিরি শেষ হবে, নতুন বিবি আবার এসে বাঁদীত্বে জায়গা করে নেবে। লইসাহীনের দল সার বেঁধে আজও যেমন ভবিষ্যতকে উপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, তেমনি তারাও চলবে, হয়ত হামাগুড়ি দেবার তাদের সাধ্য রইবে না, গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে।

অনন্তকাল অবধি ভোগীর জয়যাত্রা চলবে, বঞ্চিতের দল আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে পরকালের মোক্ষ কামনা করবে। ইহকাল তাদের অন্ধকারেই কাটবে।

পরের দিন অনেক বেলা অবধি বিবি এল না। খবর আনতে পাঠালাম। সংবাদবাহক জানাল, বিবির ঘরের লোক বড়ই বেমার। বেলা বাড়লে ওর সতীন আসবে, তখন ছুটি পাবে।

সতীন!

সংবাদবাহককে জিজ্ঞাসা করলাম, সতীন কিরে?

হেঁ বাবু, বিবির ঘরের লোক পইলা একটা বিহা করিছিল, সিটা পলাই গেল, উ-সেই। পলাই গেল, তাই উয়াক ঘরে লিলেক নাই।

সতীনের কল্পনা আজকের দিনে বিভীষিকা উৎপাদন করে, কিন্তু আদিম যুগ থেকে, যেদিন থেকে পুরুষ সমাজের সর্বময় কর্ত্তা হয়ে দাঁড়াল, সেদিনকার কথা ভেবে দেখ। সতীন থাকা ভয়ের কারণে নয়, তার সাথে রয়েছে ঈর্ষা, হিংসা, যেটা স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতার আবেগে সমাজ আজ বহু বিবাহ নিষেধ করেছে; কিন্তু সতীনের কল্পনা স্বাভাবিকতাকে কি করে অস্বাভাবিক ঘটায়, হাস্যকর ঘটনায় রূপান্তরিত করে তাই বলব তোমায়।

ওকি, তোমার ঘুম আসছে বুঝি। ঘুমিও না। আমার মামীমার কথাটা একটু শোন।

মামীমার যক্ষা হল, রক্ষা পাবার দায়ে সবাই পালাল। রয়ে গেলাম আমি একা।

যেদিন মামীমা বুঝতে পারল, মরণ তার শিয়রে, সেদিন থেকে তার নিত্যকার রুটিন বাঁধা কাজ হল, রুগ্ন দেহ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাক্স তোরঙ্গ খোলা আর সারা জীবনের সঞ্চিত কাপড় জামা টেনে বের করা। রক্তমাখা কাশ-থুতু মাখিয়ে সেই কাপড় জামাগুলো আবার বাক্সে তুলে রাখা।

জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর পেলাম, তোর নতুন মামী আসবে। সে পাবে আমার এই জিনিষপত্র। তার জন্য তো এসব নয়; তাকে ছাই দেব। এতে হাত দিয়েছে না তারও যক্ষা হয়েছে। যক্ষার বীজ ছড়িয়ে গেলাম।

উঃ কি ঈর্ষা। কি প্রচণ্ড হিংসা। শুধু কল্পনায় মানুষ এমন হিংস্র হয়ে উঠে। মামীমার এই অদ্ভুদ কাজ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হলেও সুস্থ মনে হাস্য সৃষ্টিই করে।

মামীমা দেহ রক্ষা করলেন।

তার মরদেহের সাথে তার সঞ্চয়কেও শ্মশানে জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

বলা বাহুল্য মামা আর বিয়ে করেন নি।

বিধির সতীন। তাও ভাল, তাকে নিয়ে ঘর করতে হয়নি। বিবির সাম্রাজ্যে সতীনের প্রবেশ পথ নাই, অথচ পুরাতন দিনের স্বামীকে ভুলতে না পেরে তার সতীন আসছে সেবা করতে, ভাবলেও সুখ।

রাত কটা বাজে।—সাড়ে বারোটা।

তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ, আমার চোখে ঘুম নেই।

কেন যে জেগে থাকি, কেন যে চোখে ঘুম নেই তাতো জানি না।

॥ দুই ॥

জেগে থাকা সুখের নয়। চোখ জ্বালা করে, কান বিষিয়ে উঠে, ত্বক শির শির করে, হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়। যা কুদৃশ্য, তাই এসে আচ্ছাদন করে দৃষ্টিপথ; যা শুনতে চাইনা তাই শুনতে হয় কান পেতে; যা সইবার নয়, তাই সইতে হয় দেহ-মন দিয়ে; যা অনুভব করতে চাইনা, তারই অনুভূতি এসে আঘাত দেয় হৃদয়ের কোমল বৃত্তিকে। বিচিত্র বিপরীতমুখী জীবনের লড়াই। তার চেয়ে ঘুমিয়ে থাকা অনেক সুখের, অনেক পরিতৃপ্তির। নিদ্রাহীনকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাও, ভাল লাগবে, আনন্দ পাবে; করুণ কাহিনী থেকে দূরে থাকতে পারলে সাময়িক সান্ত্বনা রইবে।

ঘুমিয়ে থাকতে চাও? —শুধু আজকের রাতটুকু জেগে থাক। বিনিদ্র রজনীর তালিকায় আর একটি রাতকে স্মরণীয় করে রেখ। অনেকটা রাত পেরিয়েছে, শেষরাতের কাহিনী হয়ত আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, কেঁপে উঠবে মানুষের কল্পনার বুনিয়াদ। কেন বা মনে হচ্ছে, চিৎকার করে উঠি, নিস্কৃতি দাও হে স্রষ্টা, তোমার সৃষ্টির মহিমাতে তুমিই মহিমান্বিত হও, আমি তার অংশ চাই না। যে ভয়ঙ্কর কাহিনী স্মৃতির দুয়ারে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সুস্থ মনটাকে অসুস্থ করে তুলেছে, সে কাহিনীর বাস্তব দিক মনুষ্যত্বকে গ্রাস করতে ছুটে আসতে পারে, তবুও ভয় পেও না। জেগে থাক। ঘুমিও না।

অখণ্ড ধৈর্য নিয়ে শাহজাদা-শাহজাদী, বাদশাহজাদা আর বিবির কাহিনী শুনলে, শুনলে মানুষের প্রতি অবিচারের

কাহিনী, শুনলে মানুষের অর্থহীন খেয়ালের কথা, শুনলে মিথ্যা আভিজাত্যের গরবে বিরাট সম্ভাবনার বিনাশ, শুধু শোন নাই অর্থের বিলাস কেমন করে নীচুতলার মানুষকে পিষ্ট হবার সুযোগ দেয়, শোন নাই নতুন সৃষ্টির কথা, শোন নাই বঞ্চনার নতুন ফরমূলা, একটু ধৈর্য ধরে শেষরাতের কয়েকদণ্ড মনকে সজাগ রাখ। তোমাকে বলব, হয়ত বলা শেষ হবে না, ভোরের পাখী ডেকে উঠবে, আকাশের বুকে অরুণালোক ভেসে উঠবে, তখন কাহিনী যদি অসমাপ্তও থাকে, তবুও আপনা থেকেই থেমে যাব। অনুযোগ করব না।

জীবনের ইতিহাস পরিপূর্ণতালাভ করে ভুয়োদর্শনে। তৈরী হয় ইতিহাসের নতুন স্বাক্ষর, সাধারণ মানুষ অজ্ঞের মত চেয়ে থাকে, হয়ত সৃষ্টি হয় শ্রেণীর ব্যভিচার। সেই ইতিহাসের নগ্ন সত্যকে তুলে ধরতে চাই তোমার সামনে।

সারিনকে মনে পড়ে? —সেই যে আশরফিলাল সারিন, নয়া সরকে যার কাপড়ের গদী ছিল। মাঝে মাঝে 'ভাবী' ডাক দিয়ে আসত। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, স্বর্ণকুমার এল। হাঁ, হাঁ, সেই সারিন।

পাশের দোতালা বাড়িটা ওর নিজস্ব ছিল। জাত দোকানদার, বলতে গেলে দোকানদারদের রাজা। দোকান ছিল জমজমাট, রুচি ছিল শালীনতাপূর্ণ। দোকানের চেয়ে বাহিরের পৃথিবীর সাথে ছিল তার বেশী ঘনিষ্ঠতা। অল্প সময়ই দোকানে থাকত। বেশীর ভাগ থাকত বাইরে, কোথায় ফুটবল, কোথায় ক্রিকেট, কোথায় সাঁতারের রেস, এসবের হদিস ছিল তার নখদর্পণে। অবসর সময় কাটাত তার পড়ার ঘরে। বই-কেতাব ছিল তার বান্ধব।

তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম, স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মৃত হয়েছি।

সেদিনের সে বয়সে যারা পথের সঙ্গী ছিল পরিণত বয়সে তাদের কোন ছাপই মনের কোনে খুঁজে পাইনি। সারিনকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম স্মৃতির অতল গহ্বরে। সেবার দিল্লী গিয়ে তাকে আবিস্কার করে ফেললাম। চাঁদনীচক পেরিয়ে রোজই চোখে পড়ত বিরাট সাইনবোর্ড। নয়া সরকের আভিজাত্য ছিল সারিন এণ্ড কোম্পানীর এই সাইনবোর্ডে। সারিন উপাধি সচরাচর চোখে পড়ে না, সেই কারণেই বোধহয় সারিনের চেহারাটা মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল। স্থির করলাম যে কোন উপায়ে হোক সারিন লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। মিলিয়ে দেখতে হবে সত্যিকার এই সারিন আর পনর বছর পূর্বের স্বর্ণকুমার এক ব্যক্তি কিনা! কিন্তু একদিন একদিন করে অনেক কটা দিন পেরিয়ে গেল। 'যাব-যাব' মনে করেও নয়া সরকে যাওয়া হচ্ছিল না। নয়াদিল্লী কেমন যেন আবেশ সৃষ্টি করেছিল! ডানে বাঁয়ে মোড় না ফিরে সোজা চলে আসতাম নয়াদিল্লীর আস্তানায়। নয়া সরকে যাওয়া হয়ে উঠত না।

আসবার আগে ভেবেছিলাম, অনেকদিন অদেখার পর বিরহিনী যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রণয়ীর বুকে, তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ব দিল্লীর জীবনে। কিন্তু পনের বছরে দিল্লীর রূপ বদলে গেছে। তুর্কী গেছে, পাঠান গেছে, মোগল গেছে, ইংরেজ গেছে, সবাই যাবার বেলায় দিল্লীর রূপ বদলে দিয়ে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিলাসের নর্মসহচরীর রূপ পরিগ্রহ করে দিল্লী ভারতের শোষকদের পীঠস্থান হয়ে রয়েছে, তাই লজ্জার তার সীমা নাই, রূপ যৌবন তার উর্ব্বশীর সমতুল্য, নির্বিকারভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সম্পদের দুয়ারে রূপোপজীবিনীদের মত। তাই দিল্লী দর্শকের কাছে পুরাতন প্রতিপন্ন হয় না, যতবার দেখা যাক না কেন, নতুন

হয়ে চোখের সামনে রূপের গৌরবে দিল্লী জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে। আমি কিন্তু থমকে গেলাম।

পুরাতন দিল্লী, শাহজাহানের মর্তের স্বর্গ শাহজাহানাবাদের দুর্গন্ধময় অলিগলি বস্তী তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানকার রূপে ঘুণ ধরেছে, মানুষ বদল হয়েছে, স্থির হয়ে রয়েছে শুধু মানুষের পুরাতন রুচি, মোগলযুগের ঐটুকু ঐতিহ্য নিয়ে ওরা বেঁচে রয়েছে।

দিল্লী!

মোগল - পাঠান - তুর্কী - ইংরেজের রাজধানী, স্বাধীন ভারতেরও।

স্বাধীনতার ও পরাধীনতার রাসায়নিক যৌগিক মিশ্রণে অধিবাসীরা যেন চাঙা হয়ে উঠেছে। চলনে কথনে সে ভাব সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কর্মধারা অচিন্তনীয়রূপে বিকশিত হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে দুষ্কর্মের মাঝ দিয়ে। পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ পরাধীনতার দান, উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতার দান। উভয়ের সংমিশ্রণে রাজধানীর সাবলীল জীবনধারা নকারজনক মনে হয়।

যমুনা ক্ষীণতোয়া খরস্রোতা শহরের কোল বেয়ে কুলুকুলু ধ্বনি করে বেয়ে চলেছে। কিনারায় লালকেল্লা, আজও তার ছায়া এসে পড়ে যমুনার বুকে। কেল্লার শেষ 'লাল'-এর কবরখানায় চেরাগ জ্বালাবার লোকও নেই।

পর্যটক-দর্শক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

লালকেল্লার পেছনে কত ইতিহাস, কত কান্না, কত হাসি, —তার ইতিবৃত্ত সন্ধান করে সন্ধানীরা।

সোজা সরক, আজমীঢ়ি দরওয়াজার বুক ভেদ করে নয়াদিল্লীর চত্বরে এসে মিলেছে। এক ধরন, এক গঠন, সারি সারি ইঁটের বাড়ি, রাজধানীর সঞ্জীবতা রক্ষা করবার

দায়িত্ব রয়েছে এই বাড়ির বাসিন্দাদের। এরাই সজীবতা রক্ষা করতে নির্জীবতার সমাধিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথম দর্শনে দর্শক ঘাবরে যায়, মনে হয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে পথের প্রতিটি ধুলিকণায়। এ ধুলিকণায় রোদনের এক বিন্দু বারিও তপ্ত হয়ে উঠে না। অশ্রু এ-ধুলিকে সিক্তও করে না। সচল রাজধানীতে হাসি আছে, মেকি আছে, কান্নার আচ্ছাদন আছে, নাই শুধু সমবেদনা। বড়ই যান্ত্রিক।

সূর্য উঠবার সাথে সাথে সাইকেলের মিছিল আরম্ভ হয়। সাড়ে দশটা অবধি বিশ্রামহীন মিছিলের স্রোত বেয়ে চলে।

জীবন্ত মানুষের দল যারা পায়ে হাঁটে তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

নিজস্ব ঘর নয়। বাড়ির দায় দায়িত্ব কারুর নেই, সারা ভারতের শিক্ষিত যাযাবর শ্রেণীর বাসভূমি এই দিল্লী, স্থায়ীত্ব-হীন বাসিন্দা। রৌপ্যচক্রের আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছে। স্থায়ী অধিবাসী একজনও খুঁজে পাও কি না সন্দেহ। পেট হাঁটায়, তাই হাঁটি হাঁটি পা-পা করে ভারতের ঐশ্বর্য, ভারতের অর্থান্বেষী মানুষের দল বর্ষার জল স্রোতের মত মিলিত হচ্ছে এই শহররূপী মহাসমুদ্রে। একদল করণিক, আরেক দল হুকুমিক, হুকুম করার কর্তা। দিল্লীর মাটির ওপর কারুরই মায়া নেই, মমতাহীন গৃহের যাযাবর বাসিন্দা সবাই।

সকাল বেলায় এরাই দল বেঁধে দপ্তরখানায় সমবেত হয়। কল কারখানার মেহনতী মজুর নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগার চিন্তা করতে হয় না, মাথার ঘাম ফেলতে হয় দপ্তর পৌঁছানর মেহনতে, দপ্তরের কাজ করবার মেহনতে নয়। দপ্তরের সুদৃশ্য কামরায় 'ফ্লোটিং প্যাসেনজার,' কলমের খস্‌খসানি রয়েছে, বিজাতিয় ভাষার খিঁচুনি রয়েছে, স্বদেশীয় রাষ্ট্র ভাষায় ধমকানি রয়েছে। সে সব শব্দ মহাকরণের দেওয়াল ভেদ করে

বাইরে পৌঁছায় না। পৌঁছালে শ্রোতারা ভীতিবিহ্বল নেত্রে চেয়ে থাকত।

রাজধানী বিরাট শহর। জনসংখ্যার চেয়ে ভূমিসংখ্যা বেশি। নগরের মাঝে উপনগর। আগে ছিল, টাইপ শহর, এখন হয়েছে নগর। অর্থের কৌলীন্য দিয়ে গড়া হয়েছে নগরের স্তর। তাদের হরেক নাম। নগরের নাম বললেই বাসিন্দার উপজীবিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় না।

সেবানগর। দেশসেবী ত্যাগী শাসককুল এখান বাস করেন না। তাঁরা সেবা পাবার অধিকারী। বহু কালের ত্যাগশীল স্বভাব ধীরে ধীরে দেহকে পঙ্গু করেছে, মনকে লোভী করেছে, তাই সেবা পাবার প্রয়েজন রয়েছে ওদের। সেই কারণেই সেবানগরের অধিবাসীরা সর্বনিম্ন উপার্জনের গৌরবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে সেবাদান করে চলেছে। তকমা বুকে ঝুলিয়ে দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে এরা অন্দরবাসী সেবা-প্রাপকদের আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। মিষ্টি করে এদের বলা হয় পিওন-আরদালী, নতুন ঢঙে বলা হয় সহকারী। সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তোমাদের চেয়ে বাংলা দেশের পাঠশালার পণ্ডিতরাও অনেক কম বেতন পান, তাদের মাথা গুঁজবারও আশ্রয় নেই; তোমাদের আশ্রয় আমরা গড়ে দিয়েছি পাকা ইঁটের ঘরে। এই তো তোমাদের গর্ব। তাদের দেহ আছে, প্রাণ থাকার লক্ষণ নেই। বাঁচতে হয় তাই বাঁচে। তোমাদেরও দেহ ও প্রাণ ঐ ইঁটের মতই শক্ত।

বিনয়নগরে থাকেন বিনয়ের অবতার কেরানীকুল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার। পুরুষরা কলম পেষে, মেয়েরা বিরতিহীন নিয়মানুবর্তিতার সাথে সন্তান প্রসব করে। আমীর ওমরাহের সৌভাগ্য নিয়ে খোস গল্প করে, পরস্পরের সন্নিকটস্থ হয়, পৃথিবীতে নতুন অতিথির আস্তানা সৃষ্টির চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়।

গুনতি পয়সা বারবার গুনে গুনে পরবর্তী অতিথির পরিচর্যার ব্যবস্থা করে। সকালে পুরুষেরা সাইকেল নিয়ে বাজারে যায়, অফিসে যায়, বিকেলে সাইকেল রেখে গৃহিনীর সাংসারিক কাজে হাত মেলায়। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাখানার গৌরবে গৃহিনীর ওপর তম্বী করে। উত্তর-ভারতীয় মেয়েদের একদল ঠোটে রং গালে রং দিয়ে রঙ্গময়ী হয়ে সালোয়ার কামিজে রূপসজ্জা করে স্বামীর বা তৎস্থানীয় কারুর হাত ধরে বাজারে বের হয়। কফি খানায় কফি খায়, গোপন কফি খানায় কারণ সেবন করে উভয়েই অনেক রাতে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। কেতায় পশ্চিমী বিলাসীকে লজ্জা দেয়। বেশভূষা থেকে আন্দাজ করতে পারবে না ওদের উপার্জনের রেশিও কত। যদি বঙ্গললনা হন তাহলে অভাব অভিযোগের কোঁদল বোধহয় বৈকালিক আনন্দ সৃষ্টির সঙ্গী হয়ে থাকে।

বেহারী মহিলারা চৌকা-বর্তনে লেগে যায়, বাবুভেইয়েরা উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে, শুভ্র পদার্থের সাথে পত্র বিশেষ হাতের চেটোতে নিয়ে "রয়েল" ভোজের ব্যবস্থায় মত্ত হয়। আর দক্ষিণীরা ইডলি-ধোসার ব্যবস্থায় মেতে ওঠে। এই নগরের পুরুষরা গৃহে বাক্যবাগীশ, কর্মক্ষেত্রে "মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেন্ট", মেয়েরা গান্ধারী আর দ্রৌপদীর সমাহার, উভয়েই রাজনৈতিক টিপ্পনীতে ল্যাস্‌কি, অর্থনীতিতে মার্কস, ধর্মনীতিতে যীশুর অবতার। অদ্ভুদ সমাবেশ।

শিক্ষায় স্নাতক, দীক্ষায় রেকর্ডহীন, অর্থের বুনিয়াদ পরিচয় দেবার মত নয়।

সাবধানে পা ফেলবে। এবার মাননগর। হুকুমিকদের কেল্লা। এ পাড়ায় রাস্তা চলতে গা ছম-ছম করে। কোন মনসবদারের কি ইজ্জত জানা না থাকলে গুনতি করে সেলাম দিতে ভুল হবে, ধমক খেয়ে মরবে। শুনতে পাবে, ডু ইউ নো

হু আই য়্যাম, নইলে রাষ্ট্রভাষায় অ-সংসদীয় গালিগালাজের টাইফুনে উড়ে চলে যাবে। লোকে যে বলে রাষ্ট্র ভাষাটা জন্মেছে প্রভুর জন্য, ভৃত্যকে গাল দিতে, এটা যে মিথ্যা নয় তা দিল্লী আসলে বেশ বুঝতে পারবে। আগে ইংরেজ বলত, 'ড্যাম সোয়াইন' সেও ছিল রাষ্ট্রভাষা, এখন মাননগরের অধিবাসীরা বলেন, 'শূয়ারকা বাচ্চা' ইত্যাদি, এটাও রাষ্ট্রভাষা। যদি প্রভুত্ব জানাবার মোহ না থাকে তা হলে নিকৃষ্ট ভাষাকে উৎকৃষ্ট বলে বাজার চালু করবার চেষ্টাও থাকত না। প্রভুদের জন্য আলাদা ভাষার প্রয়োজন থাকত না।

নীচের তলায় মানুষের কাছে এরা যম, উপর তলার মানুষের কাছে কেঁচো। গিন্নীদের গালে রং, ঠোটে রং, স্যানফোরাইজড-এর বিশেষ ভক্ত, স্বামীর অনুপস্থিতিতে ভাল হোস্টেস। টেনিসের মাঠে, রাতের ক্লাবে এরা স্বামীর সহচরী, স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গিনী। রাতের আঁধারেও চোখের রং দূর থেকে দেখা যায়, কালি দিয়ে টানা ভ্রূর রং চুইয়ে গালে ছোপ ধরে, বেড়ালের মত চোখের দৃষ্টি জ্বল জ্বলে, শিকার কখনও হাত ছাড়া হয় না। সবাই নয়, অনেকেই। পুরুষেরা নিষিদ্ধ স্থান থেকে গড়াতে গড়াতে কখনও নর্দমায়, কখনও বাড়ির উঠোনে, কখনও বা বিছানায় পৌছান। ইংরেজের তৈরী এদের অনেকেই, পুষ্টিলাভ করেছেন কালা ইংরেজী নবীশদের স্বজন পালন ক্ষেত্রে। সমষ্টির কথা বলছি না, বলছি ব্যতিক্রমহীন যারা নয় তাদের কথা।

শাননগর। পা বাড়িও না। খবরদার, আমীর ওমরাহদের আস্তানা। মোগলরাও বোধ হয় এদের বিলাস দেখে লজ্জায় অনেক সময় মাথা নীচু করতে বাধ্য হত। গোলাপ জল, আতরদান, ফ্রান্সের সোমরস, আঙ্গুর-খোবানি, সুর্মা, বাস্ আর কি চাই! রেশম পশম চোগা চাপকান আরও অনেক কিছু।

সব কথা বলা যায় না। এদের অনেকেই ত্যাগের দাবীদার, অনেকেই ত্যাগ শিক্ষা দিতে মাঝে মাঝে আকাশবাণী নিক্ষেপ করেন। ব্যক্তিগত জীবন জানি না, বাহিরের আড়ম্বরটুকুই ব্যক্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে।

অঙ্ক কষে দেখ। শাননগর আর সেবানগর। কৌলীন্য চার হাজার আর নব্বই। সমাজবাদী ধাঁচের রাষ্ট্রের পালকগোষ্ঠী এই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে দশ হাজার কেতাব লিখে ফেলছেন, দশ লক্ষ শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে 'মূঢ় জনতার' মুখের ওপর ছুড়ে মারছেন, ভবিষ্যতেও মারবেন।

নয়াদিল্লী থেকে নয়াবস্তী, আলমোড়া থেকে আখমারা, উজির থেকে জিগীরদার, রক্ষক থেকে রাখহরি, নেহেরু থেকে আমাদের লেরু মিঞা, সব জাগাতেই চার হাজারী আর নব্বই-এর ব্যবধান। এ হল জাতির আয়ের সম বণ্টন। এবাদেও বেকারের ভীড় রয়েছে, তারা পথ হাঁটতে সাহস পায় না। ধুতি পড়া মানুষ সে দেশে অমানুষ বা বনমানুষ। চোঙ্গা চাই, সে চোঙ্গা পাজামা হোক আর পাতলুন হোক, অথবা পিছমোরা করে বাঁধবার মত চুড়িদার চোগাই হোক, চাই একটা। নইলে অপাংক্তেয়—পারিয়া। এ না হলে সমাজবাদ আঁতকে উঠবে, রূপ চাই, রূপো থাক আর না থাক। নতুন সমাজবাদের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে রূপের জৌলুসে।

শাননগরের বক্তা, মাননগরের হুকুমিক, বিনয়নগরের নকলনবীশ, আর সেবানগরের ইজ্জতদার, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে থাক, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। সে জ্ঞানলাভ করতে তোমাকে আর অর্থনীতির কচকচানির পাঠ নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না।

মোগল নেই, মোগলাই রুচি রয়েছে। মিটার দিয়ে মাপলে রুচির আধিক্যই নজরে পড়বে। আমার তোমার মত লোক হুক-

চকিয়ে যাবে। যারা নতুন আগন্তুক তারাই অবাক হয়ে থাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, শাসক না শোষক, রক্ষক না ভক্ষক। মোগলাই ছোঁয়াচ থেকে এরাও বাঁচেনি। হায় শাহজাহান, হায় দিল্লী! লজ্জা করবার মত নয়, ভয় পাবার মত নয়। ভারত বুক উঁচিয়ে ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে, এই টুকুই সান্ত্বনা।

নীচের তলায় যারা, তারা নীরবে অভিযোগ জানায়, সাহস করে প্রতিবাদ জানায় না। প্রতিবাদ জানাবার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, হয় তকমা বুকে বেঁধে, নয় কলম পিষে পিষে। এরা রুটি না পেলে কেক খাবার উপদেশ শোনে, ধুতি না পেলেও পাতলুন পড়বার আদেশ পায়।

কেরানী আর হুকুমিকদের শহর, সবাই যাযাবর আর ভাগ্যান্বেষী। মহামিলন ক্ষেত্র, দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোল ও মিশ্রিত জনসংখ্যার একই জীবন ধারা, একই সমস্যা, একই বাচনভঙ্গী। আপশোষ আছে অভিযোগ আছে, তার বিকাশ নেই, প্রকাশ নেই। সুন্দর কলের মানুষ।

যে সময় আমরা ছিলাম, সে সময় ভারতীয় সবাই ছিল ইংরেজের অনুগ্রহপ্রার্থী। আজ ভারতীয়কে অনুগ্রহ জানাবার দম্ভ রয়েছে ভারতীয়দের। কৃষ্ণবর্ণের প্রাধান্য কৃশবর্ণ মানুষ সইছে, সইতে বাধ্য হচ্ছে। সবই আছে অথচ কেমন করে মানুষ তার প্রাণধর্মকে হারিয়ে ফেলেছে তাই বসে বসে ভাবতাম, ভাবনার স্রোতে নিজে যেন ভেসে যেতাম। মনে হত যাযাবরদের উপযুক্ত ক্ষেত্র দিল্লী, মাটির মায়া থাকলে এত বড় নির্লজ্জতার ডেমোনস্ট্রেশান দিতে পারত না কেউ।

ভাবনার পরিসমাপ্তি আসত না যদি সারিনের সাথে দেখা না হত। বাস্তব কথা, সারিন আমাকে এই বেদনাময় দিনগুলো

থেকে টেনে বের করে আনল। ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্বে ইচ্ছার জয় হল। সারিনের গদীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেই গদী আর নেই, বিরাট দোকান নানা চত্বরে ভাগ হয়েছে। বিক্রেতা একদল দাঁড়িয়ে, তাদের প্রভু দোতালায় ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে, সেখানে গিয়েই তার সাথে দেখা করতে হল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। পরিচয় দিলাম কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হল। এই ব্যক্তি আর আশরফিলাল বোধহয় এক ব্যক্তি নয়। হিসাব করে দেখলাম, পনর বছর পেরিয়ে গেছে অথচ পনর বছরে বক্তার মুখগহবর থেকে দন্তরাজি বিদায় নিয়েছে, মাথার বিরল কেশদামের তিনচতুর্থাংশ দুগ্ধশুভ্র হয়েছে, শরীর ক্ষীণ হয়েছে। এ কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেও আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলনা।

ধ্যানমগ্নের মত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল বাপরে, কতদিন! আমিতো ভুলেই গিয়েছি। পুরাতন দোস্তি আজও স্মরণ রেখেছেন, ধন্যবাদ। গরীবকে মনে রাখবার মত লোক তা হলে দুনিয়াতে আছে।

কথা শেষ করতেই লক্ষ্য করলাম তার দৃষ্টি ছল ছল করে উঠেছে। আমার পরিচয় তাকে ব্যথিত করল, একথা ভাবতে পারলাম না। আমি শুধু হাসলাম। ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের ছেঁড়া সুতোগুলো বেঁধে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

কর্মচারীদের সাথে কথা বলতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ভাবী সাহেবা কেমন আছে ?

বললাম, ভালই আছেন।

বিটিয়া ?

ভালই আছে।

অন্যমনস্কভাবে বলল, ভাল বলাই ভাল, নইলে হরেক প্রশ্ন করতে হয়, হরেক জবাব দিতে হয়। তাই না?

সারিন হাসল, বললাম, বিশ্বাস করছেন না!

বিশ্বাস নিশ্চয়ই করছি, কিন্তু পনর বছরে আমার দাঁত গেছে, কেশ সাদা হয়েছে, দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে, আজকে আর আশরফিলালকে চেনাই যায় না, অথচ পনরটা বছর ধরে আমার ভাবীসাহেবা আর বিটিয়া ভালই থাকল, এইতো আশ্চর্য। দামোদরবাবু, পরিবর্তনটা স্বীকার্য ধর্ম, তাকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আপনার আমার নেই। তবুও মনকে চোখ ঠারতে কসুর করি না। অন্য ভাল আছে শুনলে কেমন হিংসা হয়।

সারিন হাসল। কি যে সে বলতে চায় বুঝতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ব্যস্ত হয়ে বলল, সে কি? এখনই কোথায় চললেন? পনরে বছরে একসাথে কম করেও পাঁচশো ঘণ্টা কথাবার্তা নিশ্চয়ই বলতাম। আজ কম করেও পনরটা ঘণ্টা আমার হেপাজতে ছেড়ে দিন!

সারিনকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হল। মনে হল কিসের দুঃস্বপ্ন দেখে সবে জেগে উঠেছে। দেখা করতে এসে এক জ্বালাতনের হাতে পড়লাম দেখছি।

আমাকে জবাব দেবার অবসর না দিয়ে সারিন উঠে দাঁড়াল, এসে হাতধরে বলল, চলুন আমার বাড়ীতে, গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিন। ধন্য হোক আমার গরীবখানা।

'বিনয়' দিল্লীওয়ালাদের একচেটিয়া অধিকারের সামিল, বিশেষ করে উর্দু জবানে বিনয় জানান এত মিষ্টি হয় যে হাজার অনিচ্ছা থাকলেও সে বিনয়কে উপেক্ষা করা যায় না। বিনয়ের সামনে বিনীত হতে বাধ্য করে।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। অতি মিনতির সুরে সারিন বলল, পনর বছর পর আপনাকে পেয়েছি, আজকে আর ছুটি নেই। অনেকদিন মনে হয়েছে, কোন্ মেয়েটা এসে আমার

লেখার কলম ভাঙ্গত, দোয়াতদানী উল্টাতো। মনের কোণে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি, আজকে মনে পড়ছে, ঐ বিটিয়া-ই আমার পড়ার ঘরের অশান্তি ছিল। বিটিয়া বড় মিঠে ছিল। তার চাচাজিকে আর বোধ হয় মনে নেই। সেই আধো আধো ডাক, এখন ও যেন শুনতে পাচ্ছি। সে বোধহয় ভুলেই গেছে!

খুবই স্বাভাবিক। দু-আড়াই বছরের শিশুর মনে রাখবার মত মেধা থাকতে পারে না।

সত্যিই তাই। আমারই মনে ছিল না, সেতো শিশু ছিল সেদিন। এবার বাড়ি গিয়ে আমার কথা বলবেন, ভাবী-সাহেবাকে আর বিটিয়াকে নিয়ে একবার আসুন না এখানে। কষ্ট হবে না, আরামেই থাকবেন।

সারিন রাস্তা ছেড়ে গলিপথ ধরল। জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে কোথায় ?

আগের বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি দামোদর বাবু, ওটা ভাড়ায় দিয়েছি। একা লোক, ছোট একটা বাড়ি কিনেছি তাতেই থাকি। তার ওপর জনারণ্যকে বড় ভয়। মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করতে চাই। মানুষের সমাজে আমি যে অভিশাপ। অভিশপ্ত করে তুলতে চাই না অন্যকে। পৃথিবীর বুকে হাহাকার উঠেছে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে অনাহারীর দল, ওরা মার্জ্জনা করবে না, ওরা দয়া দেখাবে না। শতাব্দীর অভিযোগ নিয়ে কণ্ঠ চেপে ধরবে, সেদিন মৃতদেহকেও ফাঁসিতে লটকে ওরা প্রতিশোধ নেবে।

সারিন আবেগের সাথে কথা শেষ করে আমার হাত চেপে ধরল, বলল, দামোদরবাবু, সব পেয়েছি পাইনি শুধু একজন বন্ধু। আপনাকে দেখে মনে হল ঈশ্বর প্রেরিত বন্ধু আপনি একা। আপনাকেই যেন হৃদয় দিয়ে অনুসন্ধান করছিলাম।

আজ পেয়েছি। হৃদয়ের হাজার ব্যথা-ক্ষোভ বাঁধভাঙা নদীর মত বেগে ছুটে আসছে। তার কর্দমাক্ত জল থেকে আপনি-ই আমাকে রক্ষা করতে পারবেন।

কেরাণীবাজার পেরিয়ে ছোট গলির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দোতালা সেকেলে মোগল ধরণের বাড়ি চার হাত গলির মুখে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। আলোক সজ্জায় অভাব নেই। দ্বারে দ্বারী, প্রভুকে সেলাম দিয়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। দ্বারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সারিন আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে আঙ্গিনা পেরিয়ে সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

এ বাড়ির বাসিন্দা ক জন জানেন? —চারজন, আমাকে বাদ দিলে রইবে ঐ দারোয়ান, রসুইঘরের পণ্ডিতজি আর সেবাপরায়ণা শোকিয়ার মা। আমি ওদের দায়, জীর্ণ দেহ, জীর্ণ মন, শুধু অ-জীর্ণ ব্যাঙ্ক ব্যালান্স; তাই ওরা সেলাম দেয়, হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়।

ওপরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিল শোকিয়ার মা। বয়স চল্লিশের ওপর, পাহাড়ী গঠন, দেহের বাঁধন দেখে আসল বয়সের চেয়ে কম মনে হয়।

কেমন আছ শোকিয়ার মা?

শোকিয়ার মা হেসে মাথা নাড়ল।

মেহমান, সমঝি?

হাঁ সাব। হেসে শোকিয়ার মা বেরিয়ে গেল।

চোখ বুলিয়ে নিলাম গৃহসজ্জার ওপর। লক্ষপতি না হলে এমন সজ্জা সম্ভব নয়। সারিন জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন, অর্থের জৌলুস? ঐতো কাল। অর্থ এসেছে বাঁকা পথে ব্যয় হয়েছে বাঁকা পথে তবুও শেষ হয়নি!

সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

আত্মীয় কুটুম্ব অনেকেই তো থাকতে পারে এ বিশাল পুরীতে।

তা পারে। কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব মনে করবার মত একজনকেও খুঁজে পাইনি। স্ত্রী পাইনি। অনুভব করবার, আহা বলবার লোক পাইনি। যা পাইনি, তা পাবার চেষ্টার বিরাম নেই। যেদিন প্রয়োজন সত্যিকার রূপ পরিগ্রহ করল, প্রয়োজন মেটাবার মত মানুষ আর খুঁজে পেলাম না।

সারিন থেমে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার লাইব্রেরীটা আছে?

আছে, সেরকম আর নেই। চোদ্দ আনাই দান করে দিয়েছি। আমি মরলে কে পড়বে ঐ বইগুলো। পড়েই বা কি লাভ হবে। যে পাঠ জীবন গঠনের সাহায্য করেনি, সে পাঠ গ্রহণ করা বাতুলতা মাত্র। তবুও ভেবেছি, পাঠের দোষ নয়, পাঠ গ্রহণ করার যোগ্যতাই আমার ছিল না। তাই একই চাষে কেউ পায় আহার্য, কেউ পায় জহর। আমি জহর পেয়েছি, জহরত পাইনি।

শোকিয়ার মা গরম দুধ ভর্তি গেলাস, রেকাব বোঝাই খাবার এনে সামনে রাখল। পরিমান দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

সারিন আমার অবস্থা উপলব্ধি করে হেসে বলল, ফিফটি ফিফটি। তাহলেই সদগতি হবে। শোকিয়ার মা মেহমানকে বড় যত্ন করে। যেদিন তার কাছে মেহমান হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, —আচ্ছা থাক।

সারিন খাবার তুলে নিল। খাবারের প্রথম পর্ব শেষ হতেই সারিন নতুন উদ্যমে আবার গল্প সুরু করল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে সেদিকে তার খেয়াল নেই। বাধা দিয়ে বললাম, আবার কাল আসব।

অর্থাৎ আজকের এ মৌজ নষ্ট করতে চান। তা হবে না। পণ্ডিতজি।

পণ্ডিতজি রসুইখানা থেকে দৌড়ে এসে দাঁড়াল।

জোর করে আমার বাসস্থানের ঠিকানা নিয়ে পণ্ডিতজিকে পাঠিয়ে দিল সংবাদ পৌঁছাতে।

এবারতো নিশ্চিন্ত। বিনয়নগরের গরীব কেরানী আজকের রাত থেকে চক্ষুলজ্জার দায় হতে নিষ্কৃতি পেল। নির্লিপ্তের মত হাসি তার মুখে।

বাধা দিয়ে বললাম, অত ছোট কেন মানুষকে মনে করেন?

মানুষ ছোট নয়, বৃত্তি ছোট। দিল্লী শহরে ছা-পোষা বন্ধু ঠাট বজায় রাখতে হয়রান হয়ে ওঠে, তার ওপর অতিথি তার পক্ষে কালান্তক যম। মুখে বলতে পারছে না, কিন্তু পকেট শীগগিরই আকুলকণ্ঠে কাঁদতে থাকবে। তখন অতিথিকে নারায়ণ না ভেবে ভাববে নরঘাতক।

তার কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। সহপাঠী বন্ধুর সম্বন্ধে এত ছোট মতামত পোষণ করতেও কষ্ট হচ্ছিল। যেভাবে আমাকে স্টেশন থেকে সাদরে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, তাতে কোন খাদ ছিল না।

খেয়ে দেয়ে অনেক রাতে সারিন আমার বিছানায় এসে বসল।

যুদ্ধের বাজারে ধুলো সোনা হয়ে উঠতে লাগল। বে-দিশা হয়ে দু হাতে টাকা কুড়িয়ে নিতে লাগলাম। বলেই সারিন থামল। অনেকক্ষণ ধরে বিস্মৃতির অন্ধকারে কি যেন খুঁজে বেড়াতে থাকে। হঠাৎ বলে উঠল, আপনার বড় কষ্ট হল। মোগলাইখানাও নেই, বাঙালীর মাছ ভাতও নেই। পুরী-হালুয়া আর ভাজিতে কি মন ওঠে!

বাধা দিয়ে বললাম, কোন কষ্ট হয় নি। সত্যি কথা বলছি,

এমন সুন্দর পরিবেশে এমন বন্ধুকৃত্যলাভ আশা করি নাই। মাত্র দুটো বছর পাশাপাশি বাস করেছি। আপনি ছিলেন ব্যবসায়ী দোকানদার আর আমি ছিলাম কলমপেষা কেরাণী। আপনার আর আমার ব্যবধান ছিল বাস্তব, কেবলমাত্র আপনার ছোট লাইব্রেরীটি বন্ধুত্বের পরশ সৃষ্টি করেছিল। মানুষের নিত্যকার জীবনে ঐ পরশটুকুর স্থায়িত্ব অতি নগণ্য, অথচ মনে হচ্ছে, সেই স্থায়িত্বহীন সূত্রকে কেন্দ্র করেই আজ নিবীড়ভাবে আপনাকে পেয়েছি। সেইটুকুই আনন্দ, সে আনন্দের তুলনায় যদি কোথাও অসুবিধা থেকেও থাকে, তা গনণীয় নয়।

সারিন হাসল।

বলল, আগে কবিতা লিখতাম। বাবা যখন বলতেন, ধান্দা খুঁজে নে বেটা, তখন রাগ হত। জীবনের ধান্দা যে পয়সা নয় তা বাবাকে সমঝে দিতে পারিনি, কিন্তু এমন দিন এল যেদিন, সেদিন, "ইয়ে বেহেস্তকা হুরী আঁখ উঠাও"—আর মনের কোনায় দানা বাঁধতে পারল না। মাথায় চিন্তা ঢুকল কি করে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করব। আমার নতুন গোলাপবাগের সাদা চিড়িয়া স্বৌপ্যচক্র। তারই মোহে আহার নিদ্রা ভুলে গেলাম। সর্বনাশ হল সেই দিন, সর্বনাশ ঘটালাম সেদিন। কাব্যের মৃত্যু ঘটল, প্রাণ শুকিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আমি শুধু ভারবাহী গর্দভ: টাকা আমায় কালোঘোড়ায় রূপান্তরিত করল।

কিন্তু টাকার প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে তো পারেন না।

প্রয়োজনের মোহ প্রাচুর্য সৃষ্টির প্রলোভন জাগায়। প্রাচুর্য এনে দেয় অপরাধ করবার বৃত্তি। টাকা অপরাধ করায়, টাকা অপরাধীকে অপরাধ গোপন করবার অধিকার দেয়। বাধা দেবেন না, সত্যিকার টাকার মানুষ যারা তারাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অমানুষ। তারা হিংস্র, লোভী, সত্যনাশকারী, অপরাধপ্রবন।

তারা ইহকালে মার্জনা পেলেও পরকালে মার্জনা পায় না।

একবার ওখলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। মনে আছে?—আমি, আপনি, ভাবীসাহেবা আর বিটিয়া মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ওখলায় যে মেলা বসে তাকে বলে বসন্ত-মেলা, যৌবনের দূতীরা যৌবনের প্রজাপতিদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই ওখলায় গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, পয়সাই শুধু উপায় করেছি, জীবনকে তো উপভোগ করিনি, তাই বাল্যের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট চন-মন করে উঠল।

নদী শীর্ণ, স্রোত তবুও কম নয়। ওখলার নদীতে অবগাহন হল বসন্ত উৎসবের একটি অঙ্গ। সুলতানী আমলে বেগমরা স্নানে আসত বাঁদিদের মিছিল নিয়ে, সাথে আসত সুলতান আর খোজা প্রহরীর দল। জলক্রীড়া হত ওখলার বুকে। সেদিনটিতে বাঁদিদের সুরমাটানা চোখে সুলতানীর দরবার বসত। সারা হিন্দুস্থানের মানচিত্র ভাসতো নারী দেহের ওড়নায়। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করেই এই উৎসব হয় প্রতি বৎসরে। আজও ওখলার মেলায় নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি, আজও প্রেমিক-প্রেমিকা ওখলাকে মনে করে ভেনাসের পীঠস্থান।

হঠাৎ মনে হল ওখলায় বেড়িয়ে আসি। নিজেই গাড়ি চালিয়ে বের হলাম। সাঁতারের পোষাক নিলাম, খাবারের থলিয়া নিলাম, আর সাথে নিলাম তামাসা দেখবার মন।

নদীর স্রোত তর তর করে বেয়ে চলেছে।

কিনারায় জল দেখা যায় না, শুধু কালো কালো মাথা। আমিও নেমে পড়লাম সাঁতারের পোষাক পড়ে। কাচের মত স্বচ্ছ জল তোলপাড় করে শহরভাঙা মানুষের দল সাঁতারে বেড়াচ্ছে। প্রায় সবারই সঙ্গী রয়েছে, আমি কেবল একা। —আমি নয়, অনেকেই একা। হিসাব করবার ফুরসত ছিল না, তাই মনে হচ্ছিল আমি একা। নিজকে সেখানে একা ভাবতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। টাকার পাহাড়ের তলায় মানুষের সত্যকার জীবন যে চাপা পড়ে, তা বুঝলাম। সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম।

ওপরে উঠে এসে কাপড় বদল করছি, হঠাৎ হট্টগোল শোনা গেল। যৌবনের ধর্ম অসমসাহসিকতা, ঔৎসুক্য আর মাত্রাধিক বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা। কোনটাই আমার কম ছিল না। চীৎকার শোনামাত্র আমিও ছুটলাম।

জলে ডোবা একটা মেয়েকে টেনে তুলে কিনারায় বালির চরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সবারই ব্যস্ততা। তাকে বাঁচাবার তাগিদে সবাই অক্লান্তভাবে চেঁচাচ্ছে অথচ বাঁচাবার কৌশল প্রয়োগ করতে কেউ এগোচ্ছে না। ছুটে গেলাম, উপুর করে শুইয়ে দিলাম তাকে, হাত-পা টানাটানি করে নানা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে লাগলাম। যখন বোঝা গেল জীবনের স্পন্দন রয়েছে তখন তাকে নিয়ে এসে গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে তার সঙ্গীসাথীর সন্ধান করতে লাগলাম। গরম দুধ খেতে দিয়ে কিছুটা চাঙা করলাম, কিন্তু আপন জন বলে পরিচয় দেবার মত তার কেউ এগিয়ে এল না। কি করব ভেবে পেলাম না।

স্নানার্থীরা বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাও।

গাড়ি ছোটালাম হাসপাতালের দিকে। মাঝ রাস্তায় মনে হল হাসপাতালে পাঠিয়ে আর কি হবে, বরং বাড়িতে ডাক্তার ডেকে নিয়ে দেখালে বাঁচবার সম্ভাবনা বেশি। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে

বাড়ির দিকে চললাম। মনে হল, এর চেয়ে রোমান্টিক আর কিছু হতেই পারে না। পরিচয়হীনা যুবতীকে সেবা করবার সৌভাগ্য কোনমতেই হারাতে চাইলাম না। অজ্ঞাতকুলশীলা নারীর সান্নিধ্যে উন্মাদনা থাকলেও পরিণাম যে ভীতিপ্রদ হইতে পারে এ জ্ঞান তখন ছিল না।

হঠাৎ প্রশ্ন হল, আমি গাড়ীতে কেন? আশ্চর্য্য হয়ে গাড়ি থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। বললাম, তার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার কথা।

শুনে সে হাসল।

বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাসা কোথায়? সেখান আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

বলল, অনেক দূর, আজকের মত কোথাও বিশ্রাম নিতে হবে, শরীরতো ভাল লাগছে না, কোথাও আজকের মত থাকার ব্যবস্থা করুন।

ভাববার অবসর ছিল না। বিশ-বাইশ বছরের যুবতীর সামান্য অনুরোধ রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই, এ কথা অকল্পনীয়। নয়া সরকের শেঠ আশরফিলাল, আশরফির রাজা, তারই কাছে আশ্রয় চাইছে, সে আশ্রয় না দিয়ে পারে! বললাম, আমার গরীবখানায় রাত কাটিয়ে কাল ফিরে যাবেন। আশা করি আপত্তি নেই।

উৎফুল্লভাবেই সে বলব, বেশ তাই চলুন। কিন্তু বিবিজি রাগ করবে না তো?

বিবিজি! তা করলে আপনার কি? আপনিতো তার রাজ্য কেড়ে নিতে যাচ্ছেন না।

আমার কথায় বিশেষ খুশী হয়েছে মনে হল না। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। ক্লান্তিতে এলিয়ে রইল পেছনের সিটে।

গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

হৌসকাজির যে বাড়িটায় আমরা থাকতাম, যেখানে আপনিও পাশের বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়ির দরজায় এসে গাড়ী দাঁড়াল।

বাড়ির চেহারা দেখে পুতলীবাঈ, বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটির নাম পুতলীবাঈ, অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে আমার কাঁধে হাত রেখে আঙ্গিনায় নেমে এসে বলল, শুকনো শাড়ী নইলে সালোয়ার একখানা আনিয়ে দিন।

বললাম, এ বাড়িতে শাড়ি সালোয়ার আজও প্রবেশ অধিকার পায় নি।

অবাক হয়ে বলল, তা' হলে আপনার বাড়িতে চলুন।

এইতো আমার বাড়ি।

পুতলীবাঈ বুঝল। বুঝতে পেরে আঙ্গিনা পেরিয়ে আমার পেছন পেছন তেতালায় এসে বলল, একখানা ধুতি দিন। বললাম, সব ব্যবস্থা করছি।

দোকান থেকে শাড়ি ব্লাউজ আনিয়ে দিলাম। দাসী এসে বিছানা করে দিল। আহার্যের ব্যবস্থা হল।

এবার বিশ্রাম করুন। যা কিছু দরকার হবে দাসীকে ডেকে বলবেন, সে দিয়ে যাবে।

এত বড় বাড়ীতে আমি একা থাকতে পারব না।

একা কোথায়? দাসী রয়েছে, সদরে দারোয়ান রয়েছে, আর রয়েছে স্বাধীনভাবে বাস করবার, চলাফেরা করবার অধিকার।

কিছুরই আমার দরকার নেই, আপনি যাবেন না।

এতদিন অর্থ উপার্জনের নেশায় ঘুরেছি, কল্পনায় নারীর রূপ-যৌবন দেখেছি, তা নিয়ে কবিতা লিখেছি। বাস্তব জীবনে নারীর মিনতি শুনিনি, তাই পুতলীবাঈয়ের মিনতি দেবতার

প্রত্যাদেশের মত মনে হল, পৌরুষ জাগ্রত হল, নারীর মিনতি উপেক্ষা করতে পারলাম না।

পারলে বোধহয় ভাল হত!

গরম দুধের গেলাসে মুখ দিয়ে পুতলীবাঈ নামিয়ে রাখল। বলল, মিঠা দিতে বলুন। দাসীকে ডেকে বললাম। কিন্তু দাসীর দেওয়া চিনিতে তার দুধ মিষ্টি হবার নয় তা তো জানতাম না। তার দুধ মিঠে করতে যা দিতে হল তার মাশুল দিতে দিতে পরবর্তী বারটা বছর স্বপ্নের মত উপে গেছে।

আশরফি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সকাল বেলায় একমুঠো টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে পুতলীবাঈ রাস্তায় নেমে গেল, যাবার বেলায় বলে গেল, আবার দেখা হবে কিন্তু ঠিকানা দিয়ে গেল না। রেখে গেল একগাছা কালো চুল। বালিশের উপর সর্পিনীর মত এলিয়ে রয়েছে সেই একটি কেশ, আর রয়েছে খুসবয় দেওয়া তেলের গন্ধ।

সেদিন মনে হয়েছিল ঐ একটি কালো চুল দুনিয়ার সব মরকতের চেয়েও বেশি মূল্যবান। ও যেন পুতলীবাঈয়ের প্রতিভূ। আকুল আবেগে তুলে রাখলাম বুক পকেটে।

বিচার করিনি, ভবিষ্যত ভাবিনি, হাসিতে হাসি মিলিয়ে দিয়েছি, অধরে অধর, কামনায় কামনা, সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছি চোখের নেশায়। হিসাব করে দেখিনি, কত বেশী পেলাম আর আর কত বেশী দিলাম। মাতালের হিসাব করবার ক্ষমতাই বা কতটুকু!

পুতলীবাঈ চলে গেল। যা রেখে গেল তার ব্যাপ্তি যে এত বেশি তা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম।

আবার যেদিন পুতলীবাঈ এল, তখন ভাল করে তাকে

দেখলাম, রূপের চেয়ে যৌবনের জৌলুস তার বেশী, কেমন অহেতুক আকর্ষণ সৃষ্টি করবার মত তার দেহের ভঙ্গী। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কেন আস পুতলি।

সে হেসে বলেছিল, এস আমার সাথে। রাতের পর রাত তোমার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছি, আমার প্রয়োজনে নয়, তোমার অফুরন্ত অর্থের প্রয়োজনে। প্রচুর অর্থের আংশিক সদ্গতি করতে। যার অর্থ রয়েছে তাকে অপব্যয় করবার পথ খুলে দেয়াই আমার কাজ।

তা হলে ?

কিছুই নয়, প্রেম ভালবাসা ? হো-হো করে হেসে উঠেছিল পুতলী। আমাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল।

চালাও সবজীমণ্ডী। রাস্তায় নামতে নামতে বলল, কসবী নই, তবুও কসবী।

আবার বলল, সে দিন ওখলায় গিয়েছিলাম মরতে। মরতে পারিনি, তাই বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছি। রীতিমত অর্থের মূল্যে ওজন করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। পণ্য, পণ্য। তোমার রয়েছে, আমার নেই। আমার সম্পদ দিয়ে তোমার সম্পদ আহরণ করছি। শুধু হস্তান্তর হয়েছে তোমার অর্থ, লেখা হয়েছে অপব্যয়ের খাতায়। হাসতে হাসতে পুতলীবাঈ পথ পেরিয়ে গেল।

পুতলীবাঈ আরও এসেছে। বিকার অনুভব করেনি, বিচার চায়নি। বহুর মাঝে এক হয়ে সে আমার কামনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে। কাছে এসেছে, মনের কথা বলেনি। একদিন শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ বোধ হয় বুঝতে পারছ পুতলীবাঈ মিথ্যা কথা বলেনি। আজ তোমার নারী সাহচর্যের অভাব নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছ, কি হারাচ্ছ ?—উত্তর দেবার মত ভাষা সে দিন খুঁজে পাইনি। ভোগের লিপ্সায় শতাধিক নারীর গতায়াত

ঘটেছে পিতৃদত্ত গৃহে। পারিবারিক পবিত্রতাকেও গ্রাহ্য করিনি। তখন ভাববার অবসর ছিল না।

শোকিয়ার মা এল শোকিয়ার হাত ধরে। আশ্রয় প্রার্থনা করল। শোকিয়ার বয়স আর কত হবে? আঠার-উনিশ, শোকিয়ার মার বয়স তখন চল্লিশ পেরোয়নি। নজর পড়ল। অতিথি হলাম তার।

শোকিয়া নিষ্পাপ কিশোরী। দারিদ্র প্রপীড়িত শোকিয়ার মা ভুল করল। আশ্রয়ের বিনিময়ে নিজেকে হারাল, মেয়েকে ভাসিয়ে দিল। তবুও আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হল না। শোকিয়ার সন্তানকে হত্যা করলাম, শোকিয়ার মায়ের ভ্রূনকে হত্যা করালাম। উঃ অকল্পনীয় পাপ!

এ পাপও পৃথিবীতে স্থান পায়। পশুরাও মাতৃত্ব পিতৃত্বকে বিভেদ করতে জানে। মা সন্তান চেনে, পিতা সন্তান চেনে, আর সভ্যতার দাবীদার মানুষ হয়ে আমি কিছু জানিনা, কিছুই চিনি না। উঃ!

লৌহপেটিকায় অপরাধ গোপন করবার অস্ত্র রয়েছে, নিজে অপরাধী সেজেছি। দণ্ডকে পরিহার করতে আরও কতজনকে যে অপরাধী তৈরী করেছি তার সংখ্যা নেই। যাবার দিন পুতলীবাঈ বলে গিয়েছিল, তোমার আছে, আমার নেই, তুমি ব্যয় কর বিলাসে, আমি উপার্জন করি দীনতায়। রূপভেদ থাকলেও বাঁচার প্রেরণা নিয়ে আমি বিপথে পা দেই, তুমি বাঁচাকে প্রানবন্ত করতে ভোগের প্রেরণায় বিপথে পা দাও, এই শুধু পার্থক্য। তোমাকে টেনে এনেছি আমি, শুধু প্রতিশোধ নিতে।

প্রতিশোধ নিয়েছে পুতলীবাঈ। তার করুণ জীবনের আলেখ্য প্রতিশোধ নেবার প্রতীক্ষায় ছিল। তার জীবন দিয়ে

বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, মোগলপুরীর মধ্যযুগীয় বিলাস মানুষকে কোথায় টেনে যায়। সেও একদিন নিষ্পাপ ছিল, সেও একদিন চেয়েছিল নিজের সংসার গড়তে। সংসারের অভিজ্ঞতাহীন নিষ্পাপ নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুরু করেছিল অর্থের মালিকানা যাদের রয়েছে তারা, তাই সেও খুঁজে নিত নিষ্পাপ, সংসারের অভিজ্ঞতাহীন অর্থবান পুরুষকে, জোর করে টেনে নামাত বিপথে।

সত্যিই যেদিন জ্ঞান হল, সেদিন বুঝলাম, অর্থ শুধু অনর্থ সৃষ্টি করে না, আরও কিছু ঘটায়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই যারা অর্থকে আয়ত্বে পেয়েছে তারা এমনি ধারাই অপরাধ করে আসছে, সে অপরাধকে লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা রেখেছে শুধু অর্থের প্রাচুর্যে। তাই অর্থ সমাজ ভেঙেছে, অর্থ মনুষ্যত্ব বধ করেছে, অর্থ পৃথিবীতে নরক সৃষ্টি করেছে, হাহাকার তুলেছে জীবনের জাগরণে, নিদ্রায়। অর্থ ব্যর্থ মনুষ্য সমাজ ব্যবস্থায়।

আশরফিলাল থেমে গেল। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে খোলা জানালার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ভয়ঙ্কর! কত কিশোরী শুধু অর্থলাভের আশায় পেটের দায়ে এসেছে তার হিসেব নেই দামোদরবাবু। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কি করে করব ভেবে পাচ্ছি না। একজন বন্ধু নেই উপদেশ দেয়, একজন আপন জন নেই যে আহা বলে। দেহ রুগ্ন, যৌবন অকালে বিলীন হয়েছে, চিন্তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়েছে, তাই খুঁজছি একজন বন্ধু, একজন বন্ধু। আশরফিলাল দু হাতে মুখ ঢেকে বসল।

বিরক্ত হচ্ছেন। অনেক রাত হয়ে গেল, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, এবার শুয়ে পড়ুন, আমি চলছি।

বললাম, না। বসুন। এমন অকপটে নিজের দুষ্কৃতিকে

যে স্বীকার করলেন, তার জন্য আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। প্রথমে মনে হয়েছিল এমন নোংরা কাহিনী শোনবার দরকার নেই, নীতির দোহাই দিয়ে বলা যায়, আপনার মুখদর্শনও পাপ, কিন্তু আজ সে-সব অপরাধের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন, হয়ত ভোগের স্পৃহা নেই, নয়ত,—আচ্ছা থাক। চলুন কালকে কুতুব বেড়িয়ে আসি, কেমন?

আশরফিলাল থমকে গেল।

কি ভাবছেন? কুতুব যাবেন কি না?

বলছেন যখন তখন যেতেই হবে, কিন্তু কি সার্থকতা! প্রত্যেকটি পাথর যেখানে গাঁথা হয়েছে মানুষের চোখের জল দিয়ে, সেখানে মানুষ গিয়ে শান্তি পায় কেমন করে ভেবে পাইনা। তবুও যাব। প্রতিটি পদক্ষেপে পাথরগুলোও হয়ত কেঁদে উঠবে, হয়তবা,— জানেন দামোদরবাবু, অকল্পনীয় এই জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে মনে হয়েছে আমার ঐ পুরাণো বাড়ীখানার ইঁটপাথরও যেন কেঁদে উঠেছে, তাই বাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। তবুও যাব কুতুবে।

আশরফিলাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে উঠে গেল। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সারারাত এপাশ ওপাশ করতে করতে ভোর হয়ে গেল। শুয়ে রাজ্যের চিন্তার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। অন্যমনস্কতার মাঝেই ভোরের আলো নতুন দিনের সন্দেশ বহন করে আনল।

তুমি ঘুমিও না।

আশরফিলাল বড় কথা নয়, পৃথিবীতে শ্রেণী চেতনা জেগেছে। কেন জেগেছে জান? আশরফিলাল অনুশোচনা

করছে, কিন্তু যারা তার মত অর্থের অধিকারী তারা প্রাচুর্যের মোহে মানুষকে ভোগের উপকরণে পরিণত করে, অথচ তারা চিন্তাও করে না, এর পরিণতি কত ভয়ঙ্কর। এই হৃদয়হীনতা অপরকে বঞ্চিত করেছে, উৎপীড়ন করেছে, বিপথ-গামী করেছে, তাই ভবিষ্যত বংশধর তাদের মার্জনা করেনি, নতুন শ্রেণীর পত্তন হয়েছে।

পরের দিন আশরফিলালের গাড়িতে করেই কুতুব বেড়িয়ে এলাম।

কুতুবের সিঁড়িতে পা না দিয়ে সে বসে রইল লৌহস্তম্ভের নীচে। আমি আকাশে পৌঁছাবার ক্ষীণ চেষ্টা করে নেমে এসে যখন তার কাছে দাঁড়ালাম, তখনও সে তেমনি ভাবে বসে ছিল। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, নয়াদিল্লী কেমন লাগছে?

মন্দ কি।

মন্দ নয় তবে কষ্টদায়ক।

আশরফিলাল আবার পুরাণো কথায় ফিরে আসতে চায় বুঝতে পেরে বললাম, চলুন পৃথ্বীরাজের মন্দির দেখে আসি।

প্রয়োজন মনে করছি না। আপনিই দেখে আসুন।

তার অনিচ্ছার দরুনই আমাকে ফিরে আসতে হল। সারাটা পথ আর কোন কথা হল না। আমি ভাবছিলাম, তার ঐ বিতৃষ্ণার মনোগত কারণ।

একদিন খেতে বসে আশরফিলাল বলল, দামোদরবাবু, নাটক দেখেছেন? —সিনেমা নিশ্চয়ই দেখেছেন? আসল মানুষকে দেখেন নি কখনও! সাজগোজপড়া মানুষ অভিনয়

করে ; দর্শক সেই অভিনয়কে বাস্তব মনে করে আনন্দ পায়, তারিফ করে, বাহোবা দেয়। সে আনন্দের স্থায়িত্ব প্রেক্ষা-গৃহের বাইরে আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়। মনের কোনে সামান্য আঁচড়ও কাটে না, যাদের মনে আঁচড় কাটে তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় হতভাগ্য।

আমি মুখ তুলে হাসলাম। হাসিটুকু সম্মতি ও কৌতুক বহন করছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশরফিলাল তাতে যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য মানুষকে অসাধারণ অভিনেতা গড়ে তোলে। টাকার এই মহনীয় গুণটি আমরা অনেকেই লক্ষ্য করি না। না করলেও, অভিনয় চিরকাল অভিনয়। অর্থবান বলিষ্ঠ অভিনেতা। সাধারণ লোক তার অভিনয়কে মনে করে বাস্তব। পতঙ্গের মত তারা আত্মাহুতি দেয় অভিনয়ের আগুনে। অর্থবানের রুগ্ন অশ্লীল রূপ তারা দেখতে পায় না। অভিনয়ের আগুনে যারা পোড়ে তারা সারাজীবন আপশোষ করে। যারা অভিনয়কে চেনে তারা ঘৃণা করে।

আশরফি থেমে গেল। শোকিয়ার মা দুধের গেলাস এগিয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল। আমি নিরুত্তরে বসে রইলাম। হঠাৎ সে বলে উঠল, অভিনয় করে চলেছি সারা-জীবন ধরে। মনে হয়, ভোগকে সুখের মাপকাঠি মনে করে কি ভুলই না করেছি!

আপনা থেকেই আশরফিলাল হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। এ হাসির রুক্ষতায় চমকে উঠলাম।

অভিনয়। অভিনয় যদি না হত, দিবাভাগে কেমন করে শোকিয়ার মাকে জানিয়েছি অফুরন্ত ভালবাসা, রাতের বেলায় উচ্ছিষ্টের মত তাকে সরিয়ে দিয়ে শোকিয়ার কানে কানে প্রেম কাহিনী শুনেয়েছি! চমৎকার অভিনয়!

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে আশরফিলাল চুপ করে বসল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ব্যগ্রভাবে হাত ধরে বসিয়ে বলল, দামোদরবাবু, সত্যিকারের পাওয়া আমার কিছুই হয়নি। আস্তাকুঁড়ের নোংরা পেয়েছি, পেয়েছি দুর্গন্ধসিক্ত পরিতোষ। সামান্য ত্রুটিকে মনে করেছি পরিতোষের পরিপন্থী। যাকে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ দিয়ে বিশ্বাস করেছি, তার সামান্য ভুলকে মনে করেছি কোটি কোটি টাকা মূল্যের অপরাধ। তাই, কেউ ভালবাসেনি, পেয়েছি অর্থ দিয়ে অপরাধ সংঘটনের ক্ষমতা, অর্থ দিয়ে অপরাধ গোপন করবার অধিকার। পাইনি শুধু মানুষের আসল বস্তু, প্রাণের আকর্ষণ।

আশরফি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল।

আশরফিলাল নয়, আশরফিলালের চেয়েও ভয়ঙ্কর মানুষ নিয়েই সংসার। তাদের সংখ্যা কম নয়, অথচ তাদের চিনে ওঠা দায়। তবুও আশরফিলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, গাল বেয়ে চোখের জলের ঝরনা নামে।

দিল্লী থেকে ফিরতি পথে নিরাশার দুঃখ বুকে চেপে চুপ করে গাড়িতে উঠলাম। আশরফিলাল এসে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। তিনদিন চার রাত্রি তার সাথে বসবাস করেছি, কোথাও তার ব্যবহারের কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিনি। তাকে ছেড়ে আসতে বড়ই কষ্ট অনুভব করছিলাম। সেও বিদায়ের সময় কাছে আসতেই কেঁদে ফেলল। তার নীরব অশ্রুপাত কঠিন আঁচড় কেটে দিল মনের কোনায়। সে যে বন্ধু পায়নি তার জীবনে, সে যে আহা বলবার লোক চায়।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি। বাবা আদমের যুগ থেকে দুনিয়াকে মানুষ শিখিয়ে এসেছে নারীকে শ্রদ্ধা করতে, অথচ সেই শিক্ষাকে নস্যাৎ করে তার বংশধরগণ নারীকে ভোগের উপাদানে পরিণত করেছে অবিমিশ্রভাবে। ছায়াবাজীর পুতুলের মত রঙ্গভূমি থেকে আশরফি বিদায় নেবে, পুতুলী-বাঈকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তারা কি দিয়ে যাবে সমাজকে। দেবার অনেক ছিল, অথচ দেবার পথ খুঁজে পায়নি।

এরাই শুধু পায় না তা নয়। মেধা, কৃষ্টি, শালীনতাসম্পন্ন মানুষও দেবার ক্ষমতাকে পিষ্ট করে ব্যক্তিগত সুবিধা সৃষ্টির জন্য।

ট্রেনের ঝাঁকুনির সাথে তাল রাখতে রাখতে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে নবীনকে মনে পড়ে গেল! ভাবনার ক্ষেত্রে নবীনের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ, কিন্তু সেও মেধার স্বীকৃতি লাভ করবে ভেবেছিল অর্থের পেটিকায়। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে সরকারী চাকুরির আশায় ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার গরিমা সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে সে মৃত্যু ঘটাল মেধার।

স্বাধীনভাবে স্ফুরণ ঘটল না তার প্রতিভার। পদলেহীর রিপোর্ট থেকে আত্মরক্ষা করে সরকারী চাকুরি পাওয়ার আশায় সৌভাগ্যের সাথে সাথে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কন্যাকে গলায় ঝুলিয়ে নিতে সে বাধ্য হল। রক্ষণশীল পরিবারের ভাবী সম্পদ দেশের সমাজের একজন না হয়ে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর সম্পদে পরিণত হল। সে ভাবলও না পৃথিবী কি হারাল।

দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমরা তো ব্যাক-বেঞ্চের, তোমার উপরই ভরসা ছিল। ভেবেছিলাম, মুখ তুলে কথা বলবার মত রেকর্ড তুমিই সৃষ্টি করবে কিন্তু শেষ অবধি নিরাশ করেই রাখলে।

কপালে হাত দিয়ে দেখাল।

অবসর মত একদিন তার বাসায় হাজির হলাম।

গৃহস্বামী গবেষনাগারে বসে গৃহিণীর পোষা ময়নার পরিচর্ষা করছেন, গৃহস্বামীর অর্ধাঙ্গিনী নভেল মুখে নিয়ে খট্টাঙ্গে আরোহন করে রয়েছেন, সন্তান-সন্ততির দল, যার সংখ্যা অর্ধ ডজন, দাসী ও দাসের হেপাজতে রয়েছে। পরিচিত না হলে গৃহস্বামীকে চিনতে পারতাম এমন ভরসা করতে পারছি না। আপ্যায়নের অভাব ঘটল না, আহার্যের অভাব ঘটল না। ফিরবার সময় নবীন বলল, দেখলে তো কেন নিরাশ করেছি।

দেখতে পাইনি, বুঝলাম।

আমাদের এই হতভাগা দেশে যে হবে কেরাণী সে হয় বৈজ্ঞানিক, যে হবে বৈজ্ঞানিক সে হয় ফেরিওয়ালা। বিচিত্র দেশের আজব ব্যবস্থা। সে হাসল।

ম্লান সে হাসি। হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দিল, দেবার সামর্থ সে হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে সত্যকার প্রাণধর্ম।

নবীনের কথা ভাবতে কষ্ট হল।

রক্ষণশীল উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সুশিক্ষিত পিতার মধ্যযুগীয় বৃত্তিকে সে সমাদর করেছে। সজ্ঞানে দেখেছে তার বিমাতা আর নিজ মাতার কলহ। শুনেছে, সন্তান লাভের আশায় তার মাকে বিয়ে করেছিল তার পিতা একটি স্ত্রী বর্ত্তমানে। সেখানেও ভালবাসা ছিল না, ছিল সন্তান সৃষ্টির উদ্ভট আকাঙ্খা। সে বরদাস্ত করেছে পিতার বৃত্তিকে, সহ্য করেছে গর্ভধারিণীর লাঞ্ছনাকে। বাল্যের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার সাথে মিতালি করে সে বুঝেছে, অর্থ উপার্জনের জন্য স্ত্রীলাভ করা সৌভাগ্য, সেখানেও রয়েছে সন্তান সৃষ্টির লালসা। ব্যতিক্রম শুধু অপ্রীতিকর মেজাজের অংশীদারকে ভীতির চোখে দেখা। মধ্যযুগের ওপর বর্ত্তমান যুগের প্রলেপ মাত্র।

নবীন কিন্তু সে জন্য দুঃখিত নয়, দুঃখিত আমরা কেননা

সে কিছু দিয়ে যেতে পারল না সমাজকে। দেবার ক্ষমতা হয়ত ছিল, সে ক্ষমতা তার লোপ পেয়েছে। তবুও তাকে নিরঞ্জনের মত হতে হয়নি।

নিরঞ্জন কবি, নিরঞ্জন শিল্পী, নিরঞ্জন দার্শনিক, নিরঞ্জন প্রেমিক। অথচ ব্যর্থ হয়ে গেছে তার কবি প্রতিভা, মিথ্যা হয়ে গেছে তার নিপুণ তুলিকা, ভূয়ো প্রমাণিত হয়েছে তার দর্শন, বিকৃত হয়েছে তার প্রেম।

পিতার অনুরোধে কলম ছেড়ে ছুড়ি হাতে নিয়ে জীবিকার সন্ধানে চিকিৎসক হবার মহড়া দিতে হল। মনের কথা মনেই মিলিয়ে গেল, কাব্য হল ছন্দহারা, চিত্র হল প্রাণহারা।

নিরঞ্জন ডাক্তারী পড়ে।

বাবাকে চিঠি লিখল, আমি বিয়ে করব।

বাবা উত্তর লিখলেন, পরীক্ষা পাশ করে তারপর।

নিরঞ্জন আবার লিখল, অত দেরীতে নয়। ভাবী স্ত্রী বিলম্ব সইতে রাজি নয়।

বাবাও খ্যাতনামা চিকিৎসক। পুত্রের রোগ নিরূপণ করতে ব্যস্ত হলেন। পুত্রকে লিখলেন, তোমার ভাবী স্ত্রী, আমার পুত্রবধূ হবেন। সে জন্য আমার সম্মতিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। তবে যদি তুমি আমার সম্মতির অপেক্ষা করতে রাজি না হও, তাহলে আর বলবার কি আছে। তোমার মা নেই, থাকলে এর উত্তর তিনিই দিতেন।

নিরঞ্জন থমকে গেল।

কাব্য তরে রূপায়িত হয়েছিল প্রেমে। সে প্রেম অক্ষয় অমর হয়ে রইবে তার ভাবী স্ত্রীর মাঝ দিয়ে এই ছিল কল্পনা।

স্বজাতি নয়, সধর্মী নয়, অথচ লাস্যময়ী সঙ্গিনী হবার যোগ্য। নিরঞ্জন বাবার কাছে এল সম্মতি নিতে।

পিতা সম্মতি দিলেন। বললেন, কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণ ব্যয় তোমার।

তথাস্তু।

প্রেমিকা এলেন। আসামের পার্ব্বত্য নারী ও সহপাঠিনী। তাকে বলল পিতার অভিমত। প্রেমিকা নেচে উঠলেন।

তা হলে রেজেস্ট্রিটা হয়ে যাক।

রেজেস্ট্রি কেন?

আমার বিয়ে, আমার মতটা কি শুনবে না!

নিশ্চয় শুনব। কিন্তু বিয়ে হবে ছাঁদনাতলায়।

অসম্ভব। আমি কৃশ্চান, বিয়ে হবে গির্জায়।

নিরঞ্জন থমকে গেল। থমকে গেল ভবিষ্যত ভেবে। নারীর মোহে আপনজনকে সে ছাড়তে পারবে কিনা ভেবেই পেল না। সহপাঠীরা নিন্দা করল, বন্ধুরা নিষেধ করল। নিরঞ্জন ভেবে কুল কিনারা পেল না।

নিরঞ্জন চুপি চুপি একজন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে উপদেশ চাইল।

অধ্যাপক হাসলেন। বললেন, একটা কাজ কর। টাকা যেমন বাজিয়ে পকেটে তুলবে ভবিষ্যতে তেমনি সারা জীবনের সঙ্গিনীকেও বাজিয়ে নেওয়া উচিত। পথটা আমি-ই বাতলে দিচ্ছি।

কানে কানে উপদেশ দিলেন। নিরঞ্জন উপদেশের প্রতিটি অক্ষর পালন করে ধৈর্য্য ধরে বসে রইল। ফলও ফলল। একদিন আবার চুপি চুপি এসে অধ্যাপককে বলল, বিয়ে করব না স্যার।

অধ্যাপক চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আপনার কথাই ঠিক।

বয়সটা মেনে চলবে হে ছোকরা। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ধর্মের গণ্ডী ভাঙ্গা তোমার পক্ষে সহজ নয়।

হঁা স্যার। তাই নতুন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঈর্ষায় নিরঞ্জনের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। হয়ত কেঁদে ফেলত, লজ্জায় শুধু চোখ লাল হয়ে উঠল।

এবার তোমার ফাইন্যাল ইয়ার, আর ছ'মাস। ছ'মাসেই দেখতে পাবে সে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে।

সত্যিই একদিন গির্জার ঘণ্টা বাজল, মালয়ালামভাষী মিঃ টমাসের চিরসঙ্গিনীরূপে এসে দাঁড়াল কা-সীমা।

কা-সীমা নিরঞ্জনকে দেখে হাসল, হাত তুলে নমস্কার করল।

নিরঞ্জন চায়ের বাটি খালি করে বলল, 'কুবলাই কা-সীমা, কুবলাই ম'।

প্রেমের রাজ্য থেকে নিরঞ্জন বিদায় নিল। রাত জেগে কবিতা লিখল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাছা বাছা কবিতা আবৃত্তি করল। তিন দিন কলেজ কামাই করে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকল। সুটকেশ তন্ন তন্ন করে কা-সীমার ছবি চিঠি যা কিছু চিহ্ন পেল টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে দিল।

অধ্যাপক হাসলেন। বললেন, কেমন হে ছোকরা, যা বলেছি তাই না।

মাথা নীচু করে নিরঞ্জন বলল, হঁা স্যার।

এবার ভাল ছেলের মত দেশে গিয়ে প্র্যাকটিস কর। এনাটমি পড়লে, বায়লজি পড়লে, ফিজিওলজি পড়লে, এর

পরও বুঝতে পারলেনা, ও ছেঁদো ভালবাসার দাম কানা কড়িও নয়।

নিরঞ্জন পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে এল।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা এবার তুমি বিয়ে করতে পার।

নিরঞ্জন জবাব না দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে এসে বসল। বিরহীর স্বর্গ মেঘদূত। তার বঙ্গানুবাদ খুলে নিয়ে বসল। আষাঢ়ের প্রথম দিনে আকাশে মেঘ জমেছে, গুরু গুরু তার গর্জন, মদমত্ত হস্তীর মত গিরিশিখর থেকে শিখরান্তরে মেঘ ছুটে চলেছে। নিরঞ্জনের চোখে জল, বর্ষার মেঘের নয়, পরাজয়ের আক্রোশের।

নিরঞ্জনের ভাল লাগে না। ওমর খৈয়াম খুলে নিয়ে বসল। সরাব আর সাকী। মোহময়। মোহের আলপনা এঁকে দেয় আঁখির পাতে। তাও ভাল লাগে না।

নিরঞ্জন সাহিত্য সংসদ গঠন করল, আর্ট একজিবিশন করল, মনের ক্ষুধার উপকরণ সংগ্রহ করতে রাত জেগে ছবি আঁকল। নিরঞ্জন যেন ভিন্ন জগতের লোক। অনুচ্ছেদ এল পরীক্ষার ফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

নিরঞ্জন ডাক্তার।

নিরঞ্জন কবি।

নিরঞ্জন শিল্পী।

নিরঞ্জন দার্শনিক।

নিরঞ্জন প্রেমিক।

পঞ্চভূতের সমাহারে নিরঞ্জন অথর্ব হয়ে পড়ল। কোনটাই তার সাফল্য এনে দিতে পারল না। হতাশ হয়ে চাকরি খুঁজে নিয়ে কয়লার খাদে চলে গেল।

নিরঞ্জন ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলে গল্প শুনতাম। কয়লা-

খাদের গল্প। লাল মাটির বুকে কালো পাথরের স্তুপ কি করে জমা হয়। কুলি-কামিন, ধাওড়া, তাদের জীবন, তাদের মরণ, তাদের হাসি, তাদের কান্না। বলতে বলতে নিরঞ্জন ভাববিহ্বল হয়ে পড়ত।

নিরঞ্জন গল্প বলছিল। শ্রোতা শুধু আমি একা। উৎসুক শ্রোতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম, নিরঞ্জনও নিপুণতার সাথে চরিত্র চিত্রন করে চলেছিল।

বললাম, তা হলে কয়লার খাদেও কাব্য রয়েছে?

কাব্য, তা রয়েছে, যদি তা বাস্তব হয়। দেখবার মত চোখ নেই, নইলে অমর কাব্য রচনা হত। ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর একজনকে ব্যাধ হত্যা করেছিল, জন্ম নিয়েছিল মহাকাব্য। এখানেও ক্রৌঞ্চীর প্রয়োজন বিয়ের পাট্টা। ক্রৌঞ্চের বুক ফাটলেও প্রভুর প্রসাদ না হলে ক্রৌঞ্চীকে সে ফিরে পায় না। তবুও কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হয় না, বোধহয় রত্নাকরের মত দস্যু কবির অভাব রয়েছে।

নিরঞ্জন চুপ করে গেল। বড়ই বিষণ্ণ মনে হল তাকে। আমি খোঁচাখুচি করবনা ভেবেই উঠে যাচ্ছিলাম, সে আবার ডেকে বসাল, বলল, জানিস দামোদর তেত্রিশকোটি দেবতার নাম যেমন খুঁজে পাওয়া যায়না, পাওয়া যায় শুধু তাদের লীডারদের নাম, তেমনি তেত্রিশকোটি মানুষের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না এই দুর্ভাগাদেশে, যাদের নাম পাওয়া যায় তারা ঐ ইন্দ্র-চন্দ্রের মত মহামহা-লীডার শ্রেণীর মানুষ। তাদের সুখ দুঃখ নিয়েই ভারতের কাহিনী তৈরী হয়েছে, হবেও চিরকাল। যদি একবার যেতিস আমার ওখানে, তাহলে ইতিহাস রচনা করতে পারতিস। অনামা দেবতাদের কথা শুনে তুইও ভাবুক হয়ে যেতিস।

বললাম, এইতো শাশ্বত সত্য।

মোটেই নয়। জানিস, একরাতে ধাওড়াতে ডাক পড়ল। কলেরা হয়েছে। কলেরাকে প্রভুরা বড় ভয় করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষরূপী ভূতগুলো কলেরা সুরু হলেই দলে দলে পালিয়ে যায়। তাদের কাজ বন্ধ হয়। তাই প্রভুর আদেশ, কলেরাকে 'ফাইট' করতেই হবে। চললাম। রাত অনেকটা হবে। ধাওড়ার বস্তীতে জানালা থাকা অপরাধ, ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে অক্সিজেন পাম্প করে পবনদেবতা, তারই কৃপায় সত্তর বছর যার পরমায়ু সে বিদায় নেয় পঁয়ত্রিশে। গড়ে ফিফটি পারসেন্ট সাকসেস। কেরাসিন তেলের বাতি জ্বালায় রাতে, তার ধোঁয়োতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে ধাওড়ার মানুষের জীবন। সকাল বেলায় লেংটি পরে পুরুষরা গাঁইতি ঘাড়ে নেয়, মেয়েরা টুকরি নিয়ে জমির কয়লা সরায়।

খাদের তলায় জল উঠলে পাম্প করে বের করে দেওয়া হয়, সেই জলের স্রোত নালা দিয়ে চলে, সেই জলই কুলি-কামিনদের পেয়, স্নানের অপরিহার্য বস্তু, গৃহের আবর্জনা পরিষ্কারের উপকরণ।

কলেরা সুরু হয়েছে। ছুটতে হল। একটি ঘরের তিনজন অধিবাসীই আক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দুপাশের ঘর খালি করে কুলি-কামিনরা নিরাপদ এলাকায় চলে গেছে। অর্থাৎ কালো পাথর থেকে সোনা নিংড়ে নেবার যন্ত্র অচল হয়ে আসছে। অতএব ফাইট কলেরা এণ্ড আরলি।

লড়াই সুরু করলাম, তিন ঘণ্টার ব্যবধানে স্বামীপুত্রের দায় মুক্ত হয়ে বেঁচে রইল রুকমা, জোয়ান কামিন, সকাল বেলায় টুকরি মাথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসেই বমি করছে সেই প্রথম! ফাষ্ট ইন, লাষ্ট আউটের সমস্যা সামনে। সেই সাথে চলল টিকা দেবার প্রচণ্ড লড়াই।

একদিন, দুদিন, তিনদিন, করে সপ্তাহ কেটে গেল রুকমা

সেরে উঠল। যখন সেরে উঠল তখন ঘর তার খালি। জ্ঞান হয়ে ক্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখল। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিল। আমাকে আসতে দেখে তার স্মরণ হল, তারও রোগ হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেয়েছিলি ?

অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ভেদ বমি কেন হল ? পচা খাবার কিছু খেয়েছিলি কি ?

মনে করে সে কিছুই বলতে পারল না।

কলেরার প্রকোপ কমল, ধাওড়ায় আবার ভীড় জমল, আবার সন্ধ্যাবেলায় মত্ত কণ্ঠের হল্লা শোনা গেল, আবার কালো পাথর থেকে সোনা নিংড়ে নেবার ব্যবস্থা হল। কিন্তু ডাক্তারের খাতা বিনা অন্য কোথাও কোন রেকর্ড রইল না রুকমা আর ঝুমরোর।

সকালবেলায় হাসপাতালের বারান্দায় বসেছিলাম। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ল রুকমা। তার শীর্ণ চেহারা দেখে প্রথমে চিনতেই পারিনি। চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছিস।

আছি ভাল।

তবে যা কাজকর্ম কর গিয়ে।

কাজ আর নেই সায়েব। হুকুম হয়েছে ঘর ছেড়ে দেবার। তুমি একটা কাজ দাও সায়েব।

নিজকে বিপদগ্রস্থ মনে করলাম। কোন জবাব দিতে পারলাম না। রুকমা জবাব পাবার আশায় বসে রইল।

রুগী-পত্তর দেখে এগারটার সময় হাসপাতাল থেকে বের হতেই দেখতে পেলাম রুকমা তেমনি বসে আছে।

এখনও বসে আছিস কেন ? ঘর যা।

ঘর যে নাই সায়েব।

ছঁ্যাত করে উঠল বুকের ভেতর। শতমারী বদ্যি শত লোকের প্রাণ হরণ করে ডাক্তার হয়েছি, একদম পাকা ডাক্তার। মানুষের মরণ হৃদয়ের কোন সূক্ষ্মতন্ত্রীতেও আঘাত দেয় না। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফেল করলে যেমন শিক্ষকের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না তেমনি ডাক্তারের রুগী মরলেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেনা। সেই পাষানসম হৃদয়েও কেমন চাঞ্চল্য ঘটল। বললাম, আচ্ছা কোথাও এখন থাক, বড় সায়েবকে তোর কথা বলব।

রুকমা খুশী হলনা, তবুও আশ্বাস পেয়ে ফিরে গেল।

রাতের বেলায় বসে বসে ভাবছিলাম, ঘর যে নাই সায়েব। ঘর নাই। কেন নাই? কজনের ঘর আছে?—আমাদের আজব দেশ ঘর গড়বার আইন নেই, ঘর ভাঙ্গবার আইন রয়েছে। এদেশে ঘর পাবে সে যার পাবার প্রয়োজন কম, আর যার প্রয়োজন অনিবার্য সে পায় আকাশের ছাউনী। বিশ্বের সর্বত্র তার ঘর বাঁধবার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়।

আমার স্কুলের সহপাঠী ছিল অরিন্দম। চাকরি করত সওদাগরী অফিসে। হঠাৎ একদিন চাকরি গেল। ভাড়াটিয়া বাড়ির বারিন্দা। শহর কলিকাতা, এখানকার সমাজে স্থান নিরুপিত হয় অর্থের মিটারে। মিটারে 'উঠা' না থেকে 'নামা' এলেই যত সর্বনাশ। দশ বছর ধরে মাসের দুই তারিখে যে লোক ভাড়া গুনে দিয়েছে কড়ায় গণ্ডায় সে যখন দু মাসের ভাড়া দিতে পারলনা, তখন আইনের কঠিন অস্ত্র নেমে এল তার মাথার ওপর। আইন তাকে কর্ম দিলনা, আস্তানা গড়বার সুযোগ দিল না, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে পথে নামিয়ে দিতে সাহায্য করল। অরবিন্দ পথে এসে দাঁড়াল। ভাগ্যকে ধিক্কার দিল, লক্ষ্মীছাড়া সন্তানদের অভিসম্পাত দিল। আহার্যের সন্ধানে

পথে পথে পাক খেয়ে বেড়াল। তারপর একদিন অনাহারের জ্বালায় ছটফট করতে করতে দয়া মায়া, পরিবারপ্রীতি ভুলে গিয়ে ট্রেণের চাকার তলায় মাথা দিয়ে নিজেও মুক্তি পেল, মুক্তি দিল আজব দেশের প্রভুদের। স্কুলের জীবনে অরবিন্দ ছিল মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম। ভরসা ছিল অনেকেরই। কিন্তু রাজনীতির কঠিন চক্রে পা দিয়ে ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তবুও চাকরি সংগ্রহ করেছিল ইংরেজেরই সওদাগরী অফিসে। নতুন উষার জন্ম হল, ইংরেজ ছুটি নিল, সওদাগরী অফিস হাত বদলালো। অরিন্দমও ছুটি পেল, তার স্থানে এসে বসল প্রভুর দেশের লোক। ইংরেজ তাকে ঘর ছাড়া করতে পারেনি, ঘর ছাড়া করল তারা যারা কোন দিনই দেশের মঙ্গল চায় নি। প্রভুরা কৃতার্থ হল, স্বার্থসংস্থানে শ্বেতবর্ণ প্রভুদের চেয়ে এরা বেশী সজাগ।

তাই রুকমা যখন বলল, আমার ঘর যে নেই, তখন মনে হল, বোধ হয় অরিন্দমের স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়েছে। দেবার যা ছিল সব দিয়েও ওরা একটু আশ্রয় পায় নি। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলাম।

নিরঞ্জন থেমে গেল।

আমি নীরবে উঠে এলাম।

রুকমার ঘর নেই, আশরফির হাসি নেই, নবীনও প্রাণ-হীন। কেমন অপূর্ব্ব সমাবেশ।

নয়াদিল্লীর নগরের শ্রেণী যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে। আঁতকে উঠলাম। এই হল বাস্তব জীবন, এই হল জীবনকে বঞ্চনা করার আসল চিত্র।

আর আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা পরে নতুন দিন আসবে। নতুন দিন নতুন কোন বারতা নিয়ে আসবে কি? হয়ত আসবে, হয়ত আসবে না। কিন্তু বিপরীতমুখী সমস্যার কেমন সমাহার ভেবে দেখ দেখি। মানুষকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে গড়ে তুলবার দায় নেই দায়িত্ব নেই কারুরই। কেউ কখনও চিন্তা করবার অবসর পাচ্ছে না, এই বিপুল ধরণীর বুকে মানুষ জীবনের আসল লক্ষ্য কি! এক দল ব্যর্থ-অর্থের দৌলত নিয়ে অর্থহীনদের গোলামে পরিণত করছে।

শাহজাদী দিল্লী গিয়ে চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানার বক্তব্য তুমিও শুনেছ। সেই দিল্লীর আসলরূপ নিজের চোখে দেখে এসেছি। আমরা একই চোখ দিয়ে শহরকে দেখেছি। নীচের তলায় মানুষ যে দৃষ্টি দিয়ে দেখে সেই দৃষ্টি, কোথাও ঝাপসা হয়ে যায় নি, কোথাও আবিলতা নাই। বক্তব্য স্পষ্ট।

সভ্যতার প্রথম যুগে রোমক প্রভুরা দাসকে পণ্য মনে করত, দাসের জীবনমৃত্যু প্রভুর হাতে, প্রভুর ইচ্ছাই দাসের সর্বস্ব। সে যুগের কল্পনায় মানুষ আজ শিউরে উঠে কিন্তু আজকের দিনে যারা দাস তাদের মৃত্যু প্রভুর ইচ্ছায় ঘটে না, মৃত্যু ঘটে প্রভুদের কৌশলে। বঞ্চনার মাঝ দিয়ে মানুষের গোষ্ঠী ধীরে ধীরে লয় পাচ্ছে। এ অত্যাচার চোখে দেখা যায় না, তিলে তিলে অনুভব করা যায়।

দিল্লী থেকে ফিরে এসে শাহজাদীর চিঠি পেলাম। শাহজাদী ফিরে এসেছে। এই সামান্য সংবাদটুকু পরিবেশন করেছে।

হঠাৎ একদিন শাহজাদী উপস্থিত হল। ঝড়ের মত বেগ। আমি তখন সবে মাত্র বিছানায় উঠে বসেছি। এসেই বলল, হরিব্‌ল! এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গল! তোমার মত লোকই সমাজ গঠন করবে দেখছি!

তাকে শুধু বসতে বললাম। জবাব দিলাম না।

বসবার সময় নেই। তোমাকে শুধু সংবাদ দিতে এসেছি, নেমতন্ন করতে এসেছি। আমার একজন বান্ধবী আজ আসবে, তোমাকে দেখতে আসবে, তার সাথে সন্ধ্যাবেলায় বায়স্কোপ দেখতে যাব।

তাহলে নিশ্চয়ই তোমার বান্ধবীকে বলেছ যে তোমার নিজস্ব একটা চিড়িয়াখানা রয়েছে। দেখবার মত চিড়িয়াখানা।

শাহজাদীর তুফান থেমে গেল মাত্র দুইটি বাক্যে। চোখ ছল ছল করে উঠল।

কাঁদছ শাহজাদী?

কতদিন পরে এলাম, কোথায় অভ্যর্থনা জানাবে তা নয় ঠাট্টা।

আমিও যদি সেই কথাই বলি, কতদিন পরে এলে, এসে কত রকম গল্প বলবে, রাত পুইয়ে যাবে গল্প শুনতে শুনতে, তা না চিড়িয়াখানা দেখাবার নেমতন্ন করে এলে। কোনটা বড় ঠাট্টা বল দেখি।

মাপ কর, কথায় তোমার সাথে পারব না। বান্ধবী আমার স্বামীকে দেখতে চেয়েছে।

তাই আমাকে দেখাতে এনেছ!

ক্ষতি কি? স্বামীর কল্পনা বাস্তবে দেখতে পাবে।

অসহ্য তোমার ব্যঙ্গ। আসল কথাটা ভেঙ্গে বল দেখি।

আসল কথা! উইল করব। তাই বাংলা দেশে এসেছি। মনে আছে একবার অসুখ হয়েছিল!—সেই অসুখের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হয়েছিল ভ্রাতৃকুলকে। সেদিন ওরা জানত না যে পিতৃদত্ত কিছু সম্পদ আমার নামে গোপনে তোলা আছে। যে দিন টের পেল, সেদিন টাকার শোক জাগল। দাদা এসে বলল, তোমার চিকিৎসা ব্যয়টা এজমালি হওয়া

উচিত কিন্তু দিতে হয়েছে আমাকে একা। শুনে হাসলাম মনে মনে। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার হিন্দুরা দেয়নি, গর্ব করে বলবার বেলায় শুধু মৈত্রেয়ী-গার্গীর কথা বলে থাকি অথচ সন্তানের উপর অবিচার করি শুধু স্ত্রী-পুরুষ ভেদে। তাই অধিকার-বিহীন সম্পদে কেউ বোঝা হলে, বহনকারী হাসিমুখে তা বহন করে না। দাদার কথা শুনে তাই মনে মনে হেসেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিলটা এনেছ?

বিল দিয়ে আর কি হবে। ভেবেছিলাম, ননা আর নন্তু কিছু দেবে, তা আর হল না। ওরা-গা ঢাকা দিয়েছে। জানিস-তো আমার একগণ্ডা মেয়ে, তাদের জন্যও তো টাকা চাই?

বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু বিলটা পেলে ব্যবস্থা করতে পারতাম।

সামান্য শ সাতেক টাকা। বলেই ঢোক গিলল। বৌদির কাছ থেকে রিহার্সেল দিয়ে এসে যা বলতে চেয়েছিল তা বলতে পারল না। হাজার হোক মায়ের পেটের বোনতো! চেক লিখে দিলাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, বয়স ভাটার টানে ঝিমিয়ে আসছে। কিছু ব্যয় হয়ে গেছে বিলাতে পড়ার খরচ চালাতে, আছে আর সামান্য! নিজে যাই হোক চাকরি করছি। সত্যকার অভাব অনুভব করি না। কিন্তু এ টাকা তো আমার নয়, বাবার দেওয়া, তাই কিছু ব্যবস্থা করতে চাই। এবাদেও রয়েছে বাড়ির অংশটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করবে ঠিক করেছ?

ঠিক কিছুই করি নাই। তবে ভাবছি এ সবের দায় তোমার মাথায় তুলে দিয়ে যাব।

যে বস্তু তোমার নিজের নয়, যে দায় নিজে কাঁধে নিয়ে বেড়াতে পারছ না, সে বস্তু আর দায় আমার মাথায় তুলে দেবার কোন যুক্তি আছে কি? কালকে আমি যদি গিয়ে তোমার

পৈতৃকবাটির অংশ দাবী করি, তাহলে দেখতে কি খুবই ভাল লাগবে। সেখানকার কিছু পরিচয় রয়েছে কি আমার।

তুমি দাবী করবে কেন, আমার হয়ে দেখা শোনা করবে।

বাজার সরকারী করতে হবে, কেমন। যে লোক নিজের পিতৃদত্ত ভূমি কখনও চায়নি, যে লোক মনে করে নিজস্ব উপার্জনের বাইরে অন্যের উপার্জিত সম্পদে তার কোন অধিকার নেই, সেই লোক তোমার বাজার সরকারী করবে, এ অকল্পনীয়।

শাহজাদী ক্ষুণ্ণ হল।

কথান্তরে যাবার জন্য প্রসঙ্গ বদলে বলল, তোমার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি না তো?

কি জাতিয় পরিবর্তন আশা করেছিলে?

নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান।

আমি তো নিঃসঙ্গ নই। সঙ্গী আমার মন। যার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। মানুষ সমাজ চেয়েছিল, গোষ্ঠী চেয়েছিল, জাতি চেয়েছিল একক নির্জনতাকে পরিহার করতে। মানুষ ভেবেছিল তাতেই তার সর্বার্থ কাম-কর্মাণি সম্পূর্ণ হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যার সমাজ নেই, গোষ্ঠী নেই, সেই সুখে রয়েছে। তার মন প্রশান্ত, হৃদয় উদার, বৃত্তি অহম ভাবের অনেক উর্দ্ধে।

শাহজাদী চায়ের আসবাব নিয়ে বসল।

ডাকলাম, শাহজাদী!

শাহজাদী মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল, কেন?

বিদেশে কেমন লাগছে?

বিদেশ কেমন লাগছে। যে স্বদেশ-বিদেশে সমান ভাবেই বান্ধবহীন, তার অনুভূতি থাকে না। যখনই বিদেশের ভূমি ছেড়ে গাড়িতে পা দিয়েছি, তখনই ভুলেই গেছি সেখানকার কথা। অত্যাশ্চর্য নিজের কাছেই মনে হচ্ছে। যাকে ছেড়ে

আসি তার জন্য আর প্রাণ কাঁদে না, এমন কি স্মরণ করতে পারি না, কাউকে ছেড়ে এসেছি। শুধু ব্যতিক্রম একটিক্ষেত্রে, বহুবার চেষ্টা করেও সেখানে 'ভুল' করতে পারিনি।

শাহজাদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হলাম। নারী জীবনের আশা আকাঙ্খার নৈরাশ্য এতবেশী উদাসীনতা সৃষ্টি করতে পারে তা কখনও ভাবিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি চাও?

কি চাই! কি চাই না। স্বামী চাই, সন্তান চাই, সংসার চাই, গৃহের গৃহিনীপনা চাই, আর চাই স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে।

কেটলির ঢাকনা খুলে কয়েক চামচ চা ঢেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইল। আমি বলবার মত কিছু না পেয়ে চুপ করে গেলাম। এমন কষ্টদায়ক নীরবতা ঘরের আনাচে কানাচে ওঁত পেতে বসেছিল তা কখনও চিন্তা করিনি।

তাই মরতে পারছি না। মৃদুস্বরে শাহজাদী বলল।

মরণ তার কাম্য নয়, মরণ তার আসবেও না অত সহজে।

নিরঞ্জনকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কেন বিয়ে করছ না?

মনের মত বউ পাই না।

শাহজাদীও মনের মত বর পায় না।

নিরঞ্জন আর শাহজাদী কি একই তুলাদণ্ডের দুপাশে দাঁড়িয়ে! হয়ত তাই। নিরঞ্জন বঞ্চিত হয়েছে, শাহজাদী ব্যর্থ হয়েছে।

চা খেয়ে শাহজাদী চলে গেল। পেছনে রেখে গেল কান্না।

বিকেলবেলায় শাহজাদী এল বান্ধবীকে নিয়ে।

বান্ধবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে শাহজাদী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

অনেকদিন এমন রূপ দেখেনি।

শাহজাদীর মুখ কালো হয়ে গেল। কথা বলল না। কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বলল, চল বায়স্কোপ দেখে আসি।

বায়স্কোপ আমার সহ্য হয় না। চোখ চলে না।

টিকিট করেছি, অন্তত গিয়েও তো বসতে পার। একদিন বায়স্কোপ দেখতে যদি সত্যকার অন্ধ হও তাহলে আমি তোমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে বেড়াব।

বাধ্য হয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে বলল, চল বাইরে চল। শরীর ভাল লাগছে না। সুলেখা বায়স্কোপ দেখুক।

বুঝলাম, শাহজাদী সুলেখাকে নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছে! বাইরে এসেই বলল, সুলেখার রূপই আছে, ভেতরে যক্ষার পোকা থাঁক করে দিয়েছে।

জেনেও তাকে নিয়ে এল কেন?

শুধু কুতুহল, নইলে আনতাম না। এমন সুন্দর গোলাপ, কীটে তাকে শেষ করে দিয়েছে।

এই কথা বলতে ডেকে এনেছ?

নাগো না, পুরুষ জাতটাকে নিয়ে বড় ভয়।

ভয় না ঈর্ষা?

একই কথা। যেখানে সমাজের স্বীকৃতি নেই, শুধু রয়েছে ভালবাসার অলিপ্সনা সেখানে,

হো-হো করে হেসে উঠলাম।

হাসছ কেন?

যতই লেখাপড়া শেখ, যতই দেশ-বিদেশ ঘুরে আস, তুমি সেই জননী ইভের জাত। সমাজ ভালবাসাকে স্বীকৃতি দেয় না সত্য, কিন্তু ভালবাসা যদি যৌনবৃত্তির আবেদন নিয়ে না আসে, ভালবাসায় লালসার যদি মুখোস না রয় তাহলে সেখানে রূপের চেয়ে রুচি মূল্যবান। রুচিকে অবিশ্বাস করতে নেই।

শাহজাদীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল। লজ্জায় কোন কথাই বলতে পারল না। আত্মসম্বরণ করে অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলল, চল বসিগে।

তার চেয়ে দু কাপ চা খেয়ে আসি। সুলেখা ছবি দেখুক।

শাহজাদীকে নিয়ে চায়ের দোকানে বসলাম।

কিন্তু আজও ভেবে ঠিক করতে পারলাম না শাহজাদীর ঈর্ষার কেন্দ্র তুমি কেন হওনা। যেখানে অংশীদার বাস্তব, যেখানে ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত, যেখানে সমাজ মাথার কাছে এসে চোখ রাঙায়, সেখানে শাহজাদীর ঈর্ষা পৌঁছায়নি। এর চেয়ে আশ্চর্য কিছু হতে পারে কি ?

নিরঞ্জন যেমন কা-সীমাকে 'কুবলাই ম' বলে বিদায় জানিয়েছিল তেমনি ভাবে শাহজাদীর উচিত ছিল 'কুবলাই ম' বলে আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। কা-সীমার সাথে আমার যে কোথাও পার্থক্য রয়েছে, একথা ভাবতেও পারি না।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। এখুনি কা-কা করে কাকের দল আহার্য সন্ধানে বের হবে। এখনই ভোরের আলো এসে স্বাগত জানাবে, আমার কাহিনী বলা অসমাপ্ত রয়ে যাবে। এমন মধুর যামিনীতে তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে অপরাধ করেছি, সে অপরাধ মার্জনা কর।

আর কতটুকু সময় রয়েছে ?

শুনবে, শোন! শাহজাদীকে ভাল লাগছে না বুঝি?—শুনতে চাও আরও। আর বলবার মত কিছুই নেই। শাহজাদী কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেছে, পৌঁছা সংবাদ পেয়েছি. বোধ হয় বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

শাহজাদীর কাহিনী থেকে সরস অথচ করুণ কাহিনী জীবনের মাঝ দিয়ে গড়ে উঠেছে অনেকেরই তার নায়ক নায়িকা ভ্রমের মাশুল দেয় এবং দেবেও। হা হুতাশ করে, শেষে অবধি জনসমুদ্রের কোথায় মিলিয়ে যাবে, কেউ অনুসন্ধান করে হদিস দিতেও পারবে না।

থাকতাম পুণা সহরে। মাতুলালয়ে। মাতুল জঙ্গী বিভাগের ছোটখাট কর্তা। মেজাজটাও জঙ্গী ধরণের, বিশেষ করে মাতুলানীর সাথে আলাপ আলোচনায় জঙ্গীভাব ফুটে উঠত। মাতুলানী স্কুল মাষ্টারের কন্যা, কথাবার্তায় শিক্ষকতা করবার চেষ্টা। মাতুলও জঙ্গী, হুকুম দেওয়াই তার কাজ। মৌলবী আর বাদশাহের লড়াই। মন্দ লাগত না।

যে কয়দিন মাতুলগৃহের অতিথি ছিলাম, সে কয়দিন মাতুলানীর আদর আপ্যায়নে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়েছিলাম। তাই সব সময় চাইতাম বাইরে বাইরে থাকতে। থাকতামও। সকাল বেলায় পার্বতীর মন্দিরে গিয়ে বসতাম, বিকেল বেলায় বসতাম ভামবুরদা নদীর বাঁধে। অনেকটা রাত হলে বাসায় ফিরে আসতাম। প্রথম প্রথম অভ্যাগতকে আস্কারা দিয়ে রাতে ফেরাটা মাতুলানী সহ্য করেছিলেন, শেষ অবধি সহ্যসীমা অতিক্রম করল, তিনি হুঙ্কার দিয়ে আমার স্বভাব এবং সেই সাথে চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যার ফলে গৃহে বাস অসম্ভব হয়ে উঠল।

ঘটনাগুলো* অতি সাধারণভাবে ঘটে চলেছিল উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, কিন্তু ব্যাপকতা তার সুদূর প্রসারী হল। পৃথিবীতে যার কাছেই গিয়েছি, সেই মনে করেছে তারপক্ষে আমি একটা দায়, বিধবা কন্যা নিয়েও বোধ হয় তারা এত বিব্রত হয় না। তাই বিশেষ ভাবে ঠিক করেছি, নিজের পরিবেশ নিয়েই সুখে থাকব, অন্যের পরিবেশে পা দেব না।

কিন্তু সেদিনকার চিন্তাধারা তো এমন দৃঢ় ছিল না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আত্মীয়তা সৃষ্টির আবেগ ছিল, উচ্ছ্বাস ছিল। তাই যারা অনাদর করত তাদের কাছেও যেতাম। মৌখিক আপ্যায়নকে মনে করতাম জীবনের স্পন্দন। কেউ একটু আদর করলে গলে যেতাম, অনাদর পেলে মুষ্‌ড়ে যেতাম। কিন্তু যতই দিন এগোতে থাকে ততই মনে হতে লাগল, যা আমার প্রাপ্য নয় তা যদি আসে অনাহুত ভাবে তাকে শক্ত-কঠিন ভাবে বাধা দিতে হবে, নইলে অনাচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে।

এমনি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চিন্তা করবার অবসর পেয়েছি, কিন্তু মাতুলানীর অত্যাশ্চর্য ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজে পাইনি। সেই কারণ খুঁজে পেয়েছি বিশ বছর পর। বিগতা মাতুলানীর সন্তান যে দিন পিতাকে স্বীয় বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে বরযাত্রী হতে আহ্বান জানিয়েছিল, সেই দিন বুঝেছিলাম বিষবৃক্ষের ফল কতটা তিক্ততার সাথে পিতামাতাকে গলাধঃকরণ করতে হয়।

অর্ধেকরাজ্য আর রাজকন্যা পেয়ে কেরাণীপুত্র পিতাকে চোখ রাঙিয়ে উপদেশ দিল, 'জান আমি বছরে চার হাজার টাকা উপার্জন করি, সে টাকা আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সৃষ্টির জন্যই ব্যয় হবে।' পিতা বিষবৃক্ষের ফল গলাধঃকরণ কার্য সমাপ্ত করে চারহাজারী পুত্রের বধুকে আশীর্বাদ করলেন। বিধাতা

পুরুষ অলক্ষ্যে হাসলেন কিনা জানা যায়নি, তবে পুত্র তৎপুত্রের নিকট পাঁচহাজারি উপদেশ পাবার অপেক্ষায় যে রইল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সরস-করুণ জীবনের কঠিন আলেখ্য তুলে ধরতে গিয়ে মনে হচ্ছে, মাতুল ও মাতুলানীর দাম্পত্য জীবনের বিষফল উত্তর-পুরুষের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেছিল এমন নয়, অর্থের মিথ্যা গরিমার রাজ্যে আশরফিলালের নতুন সংস্করণ সৃষ্টি হল। আশরফি কেঁদেছে, এরা কাঁদতেও ভয় পাবে।

পুনায় থাকতে থাকতে একদিন মনে হয়েছিল, নীচে ঘরের বাসিন্দা সূত্রধর পরিবার কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে, অথচ আমাদের ঘরে এত অশান্তি কেন? শিক্ষার দম্ভ? অর্থের কৌলিন্য? অসম মতের মিশ্রণ?—কোনটা। স্ত্রী স্বামীগৃহে আসেন পিতৃগৃহের শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ নিয়ে, পুরুষ 'রুলিং ক্লাশ' তার পারিবারিক আদর্শ ভিন্ন। তুইটি ভিন্নমুখী পরিবারের যুবক-যুবতীর চোখ থাকে যৌনলিপ্সা, তাই সাহচর্য মধুর মনে হয়। যখন সেই লিপ্সার রেশ কমে, উদ্বেগ দেখা দেয় উভয়ের মধ্যে। সহনশীলতার অভাবে বিভিন্ন ধারাবলম্বী তুই পরিবারের যুবক যুবতী দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, মৌখিক কলহ-ই সর্বক্ষেত্রে, কোথাও তার আসুরিক প্রয়োগ দেখা যায়। মিথ্যা হয় তাদের শিক্ষা, মিথ্যা হয় 'তব ইদম্ হৃদয়ং মম,' মিথ্যা হয় সমাজ বন্ধনা অথচ উভয়কেই মেনে নিতে হয় সাহচর্যের দীনতা। অদ্ভুদ সৃষ্টির মাহাত্ম্যে বিষফল উৎপন্ন হয়, বংশ পরম্পরায় তিক্ততা, হীনতা, নীচতা সমাজের নীতিকে দগ্ধ করে।

এমন ধারাই বোধ হয় ঘটেছিল কবীনের জীবনে। শিক্ষা, দীক্ষা, গুণ, গরিমা, আভিজাত্য ও অর্থের কোথাও কোন

অনুপপত্তি ছিল না। অথচ তিনটি সন্তানের পিতা কবীনকে একদিন দেখা গেল স্ত্রীর আচ্ছাদন পরিহার করে যশোদা নাম্নী বারবনিতার গৃহে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। রসাতলে গেছে তার অতীত, রসাতলে গেছে পারিবারিক ঐতিহ্য। কবীন পরিচিত হল তার দুশ্চরিত্রের জন্য। তারপর ধীরে ধীরে কবীন নেমে গেল নরকের তলায়। একদিন কুৎসিত রোগাক্রান্ত দেহ নিয়ে এসে দাঁড়াল স্ত্রীর কাছে। যৌবনে তখন ভাটা নেমেছে, অথর্ব হয়েছে স্নায়ুসন্ধি। সেইদিন বোধহয় সে ভালবাসতে শিখল গৃহের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে।

স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে রইল। কবীন স্থান পেল না! চোদ্দ বৎসরের ব্যভিচারকে স্ত্রী মার্জনা করতে পারে নি, চোদ্দ বৎসরের অনাদরকে সে মাপ করতে পারেনি। বন্ধুজন উপদেশ দিল, অনুযোগ করল, কেউ কেউ ভয়ও দেখাল কিন্তু কবীনের স্ত্রী অটল অচল হয়ে বসে রইল।

কবীন ফিরে গেল।

কবীনের স্ত্রী শাঁখা ভেঙ্গে, কপালের সিঁদুর মুছে বৈধব্য পালন করছে। কবীন কোথায় তলিয়ে গেল সে খবর আজও কেউ এনে দিতে পারেনি। কবীনের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার লোকও ছিল না, আহা বলবার কেউ ছিল না। কবীনের অপরাধকে বিশ্লেষণ করে কখনও কেউ দেখেনি, দেখলে বোধহয় বুঝতে পারত সেখানেও ঐ অসম মনোধর্ম গোপনে কাজ করেছে। সুপ্ত মনের কোনায় যে ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তাই একদিন ফেটে পড়েছিল ব্যভিচারের মাঝ দিয়ে। কিন্তু কবীন যে উদাহরণ রেখে গেল পরিবেশ ও পরিজনের সামনে তার তিক্ত ফল ভোগ করবার ভবিষ্যত বংশধর ব্যথায় শীর্ণ হয়ে না যায়, এই হল আশঙ্কা।

পুলিশ আমায় নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি, সমাজ আমাকে সাদরে গ্রহন করেনি, যাদের আপনজন ভেবে কাছে পেতে চেয়েছি তারাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, ঘর আমার ভেঙেছে, সে ঘর বাঁধতে পারিনি এ জীবনে। শুধু রয়েছে একটা মন, যে মন অসীম বলের সাথে লড়াই করে চলেছে দুনিয়ার সাথে, দুর্মদ সেনানীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছি বিশ্বের শত্রু দুঃখের বিরুদ্ধে অন্ধকারে ও অজ্ঞাতে, কিন্তু নিজেকে হারাইনি কখনও। হারাইনি বলেই দেখবার সুযোগ পেয়েছি, অনুভব করতে চেষ্টা করেছি, তাই এই বিরাট বঞ্চনার মাঝেও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাস করতে পারছি। দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে হয়ত বাঁচার দিন গণনার মধ্যে এসে গেছে কিন্তু পরাভূত করবার মত ক্ষমতা এখনও কারুর হয়নি।

কেন যে এমন হয়েছে তা বলেই আজকের উপাখ্যানের যবনিকা টেনে দেব। রাতও নিঃশব্দে পেরিয়ে গেছে, কাক-কোকিল জেগে উঠছে, ভোরের আলো বিছানায় এসে পড়ছে, আর বলবার বেশী সময়ও নেই।

সুবর্ণা আর হারাধন। সুবর্ণা শিক্ষিকা, হারাধন পুলিশের সেপাই। সুবর্ণা সুন্দরী, হারাধন কুৎসিত। সুবর্ণা শালীনতা-পূর্ণ, হারাধন অশ্লীলতার মূর্ত প্রতীক। অর্থাৎ কর্মে কাণ্ডে দুইটি ভিন্নমুখী শক্তির অপূর্ব সমাহার।

অনেকদিন তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছি, কি করে সম্ভব হল এই অপূর্ব সমাবেশের।

সুবর্ণা ভুল ভেঙ্গে দিল। নিশ্চিন্ত ভাবে বুঝলাম, এ সমাবেশ ভিন্নমুখী নয়।

সুবর্ণা বলল, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন হারাধনবাবু

বেকার। বলতে গেলে জোর করে আমি তাকে বিয়ে করে ছিলাম। বিশ টাকা বেতনের শিক্ষিকার বিয়েতে আড়ম্বর ছিল না, লোকের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ছিল। কি করে যে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে কথা আজ মনে নেই, কিন্তু বড়ই লাজুক ছিল। আজ যে বাচালামি ধৃষ্টতা দেখছেন তা শুধু তার পেশাগত দুর্নীতির দান।

ঐ লাজুক মানুষটাকেও কাজ খুঁজে নিতে হল পরিবার পরিজনের আহার্য সংগ্রহের তাড়নায়। অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষ মানুষের পক্ষে ওর চেয়ে ভাল কাজ পাবার সম্ভাবনা কোথায়। প্রথম মাসের উপার্জনের সম্পূর্ণ টাকাটা এনে হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুমিই আমাকে কর্মী করলে।

সুবর্ণা হারাধনের প্রেরণার উৎস। হারাধন মানুষ হল। সুবর্ণার সংসারের নিত্যকার অভাব লোপ পেল।

সুবর্ণা বলেছিল, অল্পেই যারা ঘাবরে যায় সে জাতের লোক আমি নই, যদি ঘাবরে যেতাম তাহলে ওর মত নিষ্ঠা কারুর কাছে পেতাম না।

নিষ্ঠা, প্রেরণা, মনের জোর। সুবর্ণার শিক্ষা। প্রথম যৌবনে দুচার দিনের পরিচয়ের পরেই হারাধনের সামনে বসে শুনিয়ে ছিল তার কাহিনী। আমি অভিনিবেশ সহকারে শুনে উৎফুল্লভাবে ফিরে এসেছিলাম।

যেদিন আমি পথে নামলাম সে দিনের সম্বল শুধু কয়েকটি তাম্রখণ্ড। সেই তাম্রখণ্ডকে কেন্দ্র করেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দুর্দ্দান্ত গতিতে ছুটে চলেছি। বাধা পেলাম শুধু তোমার কাছে। তুমি ভেঙ্গে পড়লে। দেহ তোমার স্থবির হয়ে উঠল, আঘাতে আঘাতে মন তোমার জড়

হয়ে উঠল। নইলে, থাক আজকের মত, অভিযোগহীন জীবনে সুন্দরতার আবেশ টেনে দাও, দেখতে পাবে এতগুলো ব্যর্থজীবন কাহিনীর মাঝ দিয়েই অরুণালোকের বিচ্ছুরণ আরম্ভ হয়েছে। একদিন আসবে যেদিন মানুষকে ভালবাসার প্রেরণা নিয়ে মানুষ নব যুগের উদ্বোধন করবে।

এবার উঠ, চায়ের জল গরম কর। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে রাত জাগার ক্লান্তি মোচন কর।